

## কুরআন-হাদীছের আলোকে শবে বরাত - পর্ব ০১

Tarek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد

এখন রজবের ৫ তারিখ। শাবান মাস আসতে অনেক দেরী, দেরী আছে শাবান মাসের পঞ্চদশ রজনী তথা শবে বরাত আসতে। তাই হয়তো এই অসময়ে শবে বরাত সম্পর্কিত পোস্ট দেখে অনেকে অবাক হচ্ছেন। তবে শবে বরাত সম্পর্কে এত তাড়াতাড়ি কেন পোস্ট দেওয়া হল, তা জানার আগে সবাইকে অনুরোধ করব দয়া করে নিচের লিখাগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, কারণ শবে বরাতের পাশাপাশি নিচের বিষয়গুলো জানাও আমাদের জন্য অনেক জরুরী।

### সম্প্রীতি ও ঐক্যঃ

মুসলিম উম্মাহ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং নিজেদের একতা ও সংহতি রক্ষা করা ইসলামের একটি মৌলিক ফরয। তেমনি সুন্নাহর অনুসরণ তথা আল্লাহর রাসূলের শরীয়ত এবং তাঁর উসওয়াহ ও আদর্শকে সমর্পিত চিত্তে স্বীকার করা এবং বাস্তবজীবনে চর্চা করা তাওহীদ ও ঈমান বিল্লাহর পর ইসলামের সবচেয়ে বড় ফরয।

সুতরাং সুন্নাহর অনুসরণ যে দ্বীনের, বিধান উম্মাহর ঐক্য ও সংহতি রক্ষা এবং বিভেদ ও অনৈক্য থেকে বেঁচে থাকাও সেই দ্বীনেরই বিধান। এ কারণে এ দুইয়ের মাঝে বিরোধ ও সংঘাত হতেই পারে না। সুতরাং একটির কারণে অপরটি ত্যাগ করারও প্রশ্ন আসে না।

কিন্তু এখন আমরা এই দুঃখজনক বাস্তবতার সম্মুখীন যে, হাদীস অনুসরণ নিয়ে উম্মাহর মাঝে বিবাদ-বিসংবাদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই অবস্থা প্রমাণ করে, আমাদের অনেকে সুন্নাহ অনুসরণের মর্ম ও তার সুন্নাহসম্মত পন্থা এবং সুন্নাহর প্রতি আহ্বানের সুন্নাহসম্মত উপায় সম্পর্কে দুঃখজনকভাবে উদাসীন। তদ্রূপ মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সংহতির সঠিক উপলব্ধি এবং ঐক্যবিনাশী বিষয়গুলো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে ভ্রান্তি ও বিভ্রান্তির শিকার। সুন্নাহর অনুসরণ এবং উম্মাহর ঐক্য উভয় ক্ষেত্রে আমাদের সমাজে চলমান অবহেলা ও ভুল ধারণা ব্যাপক।

আল্লাহপাক কোরআনে বলেনঃ

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿١﴾ فَتَقَطُّوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٢﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ جِيئَ ﴿٣﴾

(তরজমা) ‘ নিশ্চিত জেনো, এই তোমাদের উম্মাহ, এক উম্মাহ (তাওহীদের উম্মাহ) এবং আমি তোমাদের রব। সুতরাং আমাকে ভয় কর। এরপর তারা নিজেদের দ্বীনের মাঝে বিভেদ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল। প্রত্যেক দল (নিজেদের খেয়ালখুশি মতো) যে পথ গ্রহণ করল তাতেই মত্ত রইল। সুতরাং (হে পয়গাম্বর!) তাদেরকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত মূর্খতায় ডুবে থাকতে দাও।

সূরা মুমিনুন (২৩) : ৫২-৫৩

এখানে যেটি খেয়াল রাখা দরকার তা হল হক সম্পর্কে নিশ্চিত জ্ঞান আসার পর এ বিভেদ-বিচ্ছিন্নতা কেবল জিদ ও হঠকারিতার কারণেই হয়ে থাকে। আর এই বিভেদের দায় ঐ মতভেদকারীকেই বহন করতে হবে। যারা হকপন্থী, তাদেরকে নয়। কারণ ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ ও মৌলিক আকিদা ও বিধান। যারা এর

উপর আছে তারা তো মূল পথেই রয়েছে। যারা মতভেদ করেছে তারা এই পথ থেকে সরে গেছে এবং বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতার জন্ম দিয়েছে। আর এ কথা বলাই বাহুল্য যে, তাওহীদের বিষয়ে বা দ্বীনের অন্য কোনো মৌলিক বিষয়ে হক থেকে বিচ্যুত হওয়া বা সন্দেহ-সংশয় পোষণ করা খেয়ালখুশির অনুগামিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আল্লাহ কোরআনে বনী ইসরাঈল সম্পর্কে বলেনঃ

" আমি তাদেরকে দ্বীনের সুস্পষ্ট বিধানাবলি দান করেছিলাম। অতপর তারা যে মতভেদ করল তা তাদের কাছে ইলম আসার পরই করেছিল শুধু পরস্পর বিদ্বেষবশত। তারা যে বিষয়ে মতভেদ করত তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মাঝে ফয়সালা করে দিবেন। এরপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ শরীয়তের উপর রেখেছি। সুতরাং তা অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না।"

সূরা জাছিয়া

এখানে ইসলামের অতুলনীয় ও ন্যায়সঙ্গত শিক্ষাটিও লক্ষণীয় যে, যারা মৌলিক বিষয়ে মতভেদ করে বিচ্ছিন্ন হল তাদের সাথেও জুলুম-অবিচার করা যাবে না ; তাদের সাথেও ন্যায়বিচার করতে হবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেনঃ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَنفَشُلُوا وَتَذْهَبَ رِيكُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর। পরস্পর বিবাদ করো না তাহলে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চিত জেনো, আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।

সূরা আনফাল (৮) : ৪৬

এ আয়াতে ‘ তাওহীদ ফিততশরী’ তথা একমাত্র আল্লাহকেই বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করার আদেশ আছে। শর্তহীন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহর এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর রাসূলের। অন্য সকলের আনুগত্য এ আনুগত্যের অধীন। সাথে সাথে কলহবিবাদ থেকে বিরত থাকার আদেশ করা হয়েছে এবং এর বড় দুটি কুফল সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে : এক. এর দ্বারা উম্মাহ শক্তিহীন হয়ে পড়বে, দুই. তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি লোপ পাবে।

অন্যদিকে অন্য আয়াতে বলা হয়েছেঃ

‘ মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মাঝে মীমাংসা করে দাও। আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।

সূরা হুজুরাত

তাই আমাদের কর্তব্য হল, আমরা যাতে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না করি। আর যদি কোন বিষয়ে মতভেদ থাকে, তাহলে আমাদের উচিত তা সুন্দর করে মুমিনদের বুঝিয়ে দেয়া। নিছক কোন ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা যাতে কোন বিষয়ে (শরীয়তের বা ব্যক্তিগত) একে অপরের সমালোচনায় লিপ্ত না থাকি।

কারণ

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ‘ তোমরা ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কারণ ধারণা হচ্ছে নিকৃষ্টতম মিথ্যা। তোমরা আঁড়ি পেতো না, গোপন দোষ অন্বেষণ করো না, স্বার্থের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ো না, হিংসা করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, সম্পর্কচ্ছেদ করো না, পরস্পর কথাবার্তা বন্ধ করো না, একে অপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিও না, দাম-দস্তুরে প্রতারণা করো না এবং নিজের ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের মাঝে ক্রয়-বিক্রয়ের চেষ্টা করো না । হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ যেমন আদেশ করেছেন, সবাই তোমরা আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে যাও।’

-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৫১৪৩, ৬০৬৪, ৬০৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৬৩/২৮, ২৯, ৩০ ও ২৫৬৪/৩২, ৩৩

এ সকল হাদীসের শিক্ষা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে এক বাক্যে ইরশাদ করেছেন-

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

মুসলিম সে, যার মুখ ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে।

-সহীহ বুখারী, হাদীস : ১০

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর হুক আদায়ের সাথে বান্দার হুকও আদায় করে সে-ই প্রকৃত মুসলিম।

কাযী ইয়ায রাহ. বলেছেন, ‘ সম্প্রীতি দ্বীনের অন্যতম ফরয, শরীয়তের অন্যতম রোকন এবং বৈচিত্রে পূর্ণ মুসলিমসমাজকে একতাবদ্ধ করার উপায়’ । ’

-শরহ সহীহ মুসলিম ২/১০, বৈরুত

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য এই যে, আমরা যখন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, তখন এই বিষয়টি মাথায় রাখা দরকার যে, আমরা সবাই মুসলিম এবং আমরা যা বলব তা শুধুমাত্র ইসলামের স্বার্থেই বলব, কোন কাফির মুশরিককে খুশি করার জন্য নয়। ঠিক তেমনি কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে, তা আমরা কোরআন সুন্নাহর আলোকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিব, কিন্তু কোন ধরনের ঝগড়া বিবাদ করব না, মুমিনের অন্তর হবে কোমল। সবসময় সম্প্রীতি বজায় রাখার চেষ্টা করব। আমাদের মনে রাখতে হবেঃ

গোটা সমাজ যেন হয় এ হাদীসের জীবন্ত নমুনা-

المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله.

মুসলিমেরা সকলে মিলে একটি দেহের মতো, যার চোখে ব্যথা হলে গোটা দেহের কষ্ট হয়, মাথায় ব্যথা হলেও গোটা দেহের কষ্ট হয়।

-সহীহ মুসলিম, হাদীস : ২৫৮৬/৬৭

সবাই জানেন, দাউদ আ. ছিলেন আল্লাহর নবী। তাঁর পুত্র সুলায়মান আ.ও নবী ছিলেন। এক মোকদ্দমার রায় সম্পর্কে দুজনের মাঝে ইজতিহাদগত মতপার্থক্য হল। আল্লাহ তাআলা কুরআন মজীদে তাদের মতপার্থক্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন এবং সুলায়মান আ.-এর ইজতিহাদ যে তাঁর মানশা মোতাবেক ছিল সেদিকেও ইশারা করেছেন। তবে পিতাপুত্র উভয়ের প্রশংসা করেছেন। তো এখানে ইজতিহাদের পার্থক্য হয়েছে, কিন্তু বিভেদ

হয়নি। এই পার্থক্যের আগেও যেমন পিতাপুত্র দুই নবী এক ছিলেন, তেমনি পার্থক্যের পরও।

(দেখুন : সূরা আশ্বিয়া (২১) : ৭৮-৭৯)

তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে কুরতুবী (১১/৩০৭-৩১৯) ও অন্যান্য তাফসীরের কিতাব দেখে নেওয়া যায়।

### মূল বিষয়ে ফিরে আসিঃ

ইদানীং কালে শবে বরাত নিয়ে মানুষদের মাঝে বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে। কেউ কেউ এর ফাযাইল বর্ণনা করছেন, আবার কেউ কেউ এর অস্তিত্বকেই পুরোদমে অস্বীকার করে বসছেন। আবার কেউ কেউ আমলের নামে অনেক বিধর্মীদের রেওয়াজও অনুসরণ করছেন। উম্মাতের এই করুণ অবস্থায় যেখানে আমাদের এক হয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া দরকার, সেখানে প্রতিষ্ঠিত বিষয়ে কলহ সৃষ্টি করা এবং এ নিয়ে মাতামাতি করা উম্মাতের ঐক্যের জন্য অনেক ক্ষতিকারক। তবে উম্মাতের ঐক্যের পাশাপাশি, কোরআন সুন্নাহর সঠিক বুঝের অভাবে কেউ যেন কোন আমল থেকে বিচ্যুত না হয়ে পড়েন কিংবা আমলের নাম করে বিদআত বা শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত না হয়ে পড়েন সেদিকে খেয়াল রাখাও জরুরী। কারণ আমরা সবাই জানি আল্লাহ পাক মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্য। তাই ইবাদতে যাতে কম না হয় কিংবা ইবাদতে যাতে ত্রুটি না হয়, এজন্য আমাদেরকে সজাগ থাকতে হবে।

এজন্য আগত শাবানের পঞ্চদশ রজনীকে সামনে রেখে ধারাবাহিক ভাবে কোরআন ও হাদীছের আলোকে পবিত্র শবে বরাতের অবস্থান কেমন, তা আলোচনা করার চেষ্টা করব। এই ধারাবাহিক আলোচনার মধ্যে থাকবেঃ

- ১। শবে বরাত সম্পর্কিত কিছু ভূমিকা এবং শবে বরাতের নামের পরিচিতি
- ২। সূরা দুখানের তাফসীর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ সমূহ থেকে উদ্ধৃতি, তাফসীরের মাঝে বিরোধ মীমাংসার নীতিমালা এবং সেই নীতিমালার আলোকে সূরা দুখানের তাফসীর
- ৩। উসূলে হাদীছের কিছু নীতিমালা, অতঃপর শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীছ এবং সেসব হাদীছ সম্পর্কে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মতামত
- ৪। হাদীছের আলোকে শবে বরাতের ফজীলত ও আমলসমূহ
- ৫। শবে বরাতে করণীয় ও বর্জনীয়

প্রতিটি বিষয় ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তবে এই ব্যস্ত জীবনে অনেকে ব্লগের পোস্ট পড়ার জন্য বেশি সময় পান না বলে, আমার পোস্ট গুলো সংক্ষেপ করে পর্ব বাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করব। তাই রজব মাসের শুরুতেই এই বিষয়ে লিখা শুরু করেছি, যাতে শাবানের পঞ্চদশ রজনী আসতে আসতে আমরা সবাই শবে বরাত সম্পর্কে কোরআন হাদীছের আলোকে স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারি।

তবে এখানে উল্লেখ্য যে, কারো কোন বিষয়ে দ্বিমত থাকলে তা সুন্দর করে শালীন ভাষায় উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা হল, ঝগড়া বিবাদ সম্পূর্ণ পরিহারযোগ্য।

আল্লাহপাক আমাদের সবাইকে সহীহ এলেম ও সহীহ আমল করার তৌফিক দান করুন এবং কোরআন ও হাদীছের আলোকে শবে বরাত সম্পর্কে জানার জন্য এই পোস্টসমূহের সাথে থাকার তওফীক দান করুন। আমীন।

.....

পর্ব ০২

ভূমিকাঃ

এতদিন পর্যন্ত শবে বরাতকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর মানুষ বাড়াবাড়িতে লিপ্ত ছিল। তারা এ রাতটি উপলক্ষে নানা অনুচিত কাজকর্ম এবং রসম-রেওয়াজের অনুগামী হচ্ছিল। উলামায়ে কেরাম সবসময়ই এসবের প্রতিবাদ করেছেন এবং এখনো করছেন।

আবার ইদানিং আবার এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছাড়াছাড়ির প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তাদের দাবী হল, ইসলামে শবে বরাতের কোন ধারণা নেই। এ ব্যাপারে যত রেওয়ায়েত আছে সব মওয়া বা যয়ীফ। এসব অনুযায়ী আমল করা এবং শবে বরাতকে বিশেষ কোন ফযীলতপূর্ণ রাত মনে করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়। তারা এসব বক্তব্য সম্বলিত ছোটখাট পুস্তিকা ও লিফলেট তৈরী করে মানুষের মধ্যে বিলি করে।

বাস্তব কথা হল, আগেকার সেই বাড়াবাড়ির পথটিও যেমন সঠিক ছিল না, এখনকার এই ছাড়াছাড়ির মতটিও শুদ্ধ নয়। ইসলাম ভারসাম্যতার দীন এবং এর সকল শিক্ষাই প্রাস্তকতা মুক্ত সরল পথের পথ নির্দেশ করে।

শবে বরাতের ব্যাপারে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হল, এ রাতের ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সম্মিলিত কোন রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদযাপনের বিশেষ কোন পন্থা উদ্ভাবন না করে বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য রেওয়াত দ্বারা প্রমাণিত। এই রাতকে অন্য সব সাধারণ রাতের মতো মনে করা এবং এই রাতের ফযীলতের ব্যাপারে যত হাদীস এসেছে, তার সবগুলোকে মওয়া বা যয়ীফ মনে করা যেমন ভুল, অনুরূপ এ রাতকে শবে কদরের মত বা তার চেয়েও বেশি ফযীলতপূর্ণ মনে করাও ভিত্তিহীন ধারণা।

মুসলিম উম্মাহের মাঝে রাতটির এহেন চর্চা না আজকে-এই মাত্র জন্ম নিয়েছে, না বছর কয়েক আগে, না একটি মাত্র যুগের তফাতে এর আগমন ঘটেছে। বরং ইসলামের শুরু লগ্ন থেকে যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর ধরেই এর চর্চা চলে আসছে। আবার এমনও নয় যে, কারো ভিন্ন প্রক্রিয়ার স্পন্দনে রাতটির গুরুত্ব মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। বরং এ রাতের ফজীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে যেমনি অপ্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে তেমনি বেশ কিছু হাদীছের স্পষ্ট বক্তব্যের মাধ্যমে এ রাতের মাহাত্ম-গুরুত্ব ও আমলসমূহ স্বীকৃত-প্রমাণিত।

এ সকল কারণে যুগ যুগ ধরে সকল ওলী বুজুর্গ, আহলে হক নবীর সাক্ষা উম্মাত শবেবারাতের মর্যাদা দিয়ে এসেছেন। ওলামা-মুহাদ্দিসীন, আওলিয়া-বুযুর্গানেদ্বীন, ফুকাহা-আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের কাছে এ রাতের গুরুত্ব-মাহাত্ম ও ফজীলত স্বতঃস্বীকৃত। তারা সুস্পষ্ট করে বলে গেছেন শবেবরাতে যে কোন ইবাদত একটি মুস্তাহাব ও ঐচ্ছিক আমল-এটাকে অস্বীকার করা বা গুরুত্বহীন বলা যেমনিভাবে কুরআন-হাদীছকে অস্বীকার করার নামান্তর ঠিক তেমনিভাবে একে পূজি করে নিজের পক্ষ থেকে বিদআতে সাযিয়াহ যুক্ত করা বা এটাকে পার্থিব কোন আনন্দ উৎসবের ন্যায় মনে করা সাংঘাতিক ধরণের গুনাহের কাজ।

ইসলামে শবে বরাত বলতে কিছু নেই- এ ধারণাটির উৎপত্তি খুব বেশি দিন আগের নয়, যারা এ কথা বলে থাকেন, তারা সবাই মিথ্যুক এবং ফিতনা সৃষ্টিই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। টিভি, রেডিও ও তথ্যপ্রযুক্তির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে তারা ইসলামের নামে মুসলমানদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির করার এবং নবীর সুন্নাহ থেকে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। আর অবস্থাটা এমন দাড়িয়েছে যে, তাদের সামনে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করলেও তারা তা মানতে নারাজ।

হুজুরে পাক (সঃ) বলেছেনঃ আমার পরবর্তী উম্মাতেরা পূর্ববর্তীদের নিচু চোখে দেখবে। তারা তাদের ভৎসনা করবে এবং বলবে যে তারা ভুল করেছে এবং ভুল বুঝেছে।

এই কথার সত্যতা আজ আমরা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আমরা এখন দেখতে পাই, কিছু তথাকথিত উলামা পূর্ববর্তী জগত বিখ্যাত বুজুর্গদের সমালোচনায় দিনরাত মগ্ন থাকেন। এমনকি তাদের সাহাবাদের সমালোচনা করতেও দেখা যায় !! আল্লাহপাক আমাদের জিহবাকে হেফাজত করুন। আমীন।

শবে বরাত ও কোরআনঃ

পবিত্র কোরআনের ২৫ তম পারা ও ৪৪ নং সূরা “ দুখানের ” শুরুতে যে পাঁচটি আয়াত রয়েছে সে আয়াতগুলোই মূলত শবে বরাত ও পবিত্র কোরআন - এ বিষয়ক আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ।

- ১। তাফসীরে কবীর
- ২। তাফসীরে রুহুল মাআনী
- ৩। তাফসীরে রুহুল বায়ান
- ৪। তাফসীরে কুরতুবী
- ৫। তাফসীরে তবরী
- ৬। তাফসীরে বগবী
- ৭। তাফসীরে খায়েন
- ৮। তাফসীরে ইবনে কাসির ইত্যাদি

পবিত্র কোরআনের এ সমস্ত বড় বড় তাফসীর গ্রন্থগুলোর মাঝে বিচার বিশ্লেষণ করার পর অভিজ্ঞ আলেমদের নিকট এ কথা সুস্পষ্ট যে, উক্ত আয়াতের " লাইলাতুম মুবারাকাহ " (বরকতময় রাত) শব্দের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তাফসীর হলো শবে রুদর; শবে বরাত নয়। তবে সাথে সাথে জমহুর উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্ত এও যে, প্রথম মত অগ্রাধিকার পেলেও (অর্থাৎ শবে রুদর) দ্বিতীয় মতকে (শবে বরাত) উপেক্ষা করার কোন অবকাশ নেই।

শবে বরাত ও হাদীছঃ

শবে বরাত ও তার ফাযায়েল সম্পর্কিত অনেক হাদীসই হাদীসের কিতাবে দেখতে পাওয়া যায়। তার মধ্যে কিছু হাদীস সহীহ, কিছু হাদীছ হাসান, কিছু জঈফ (তবে অতি দুর্বল নয়)। তদুপরি এ জঈফ হাদীছগুলো বহু সহীহ ও হাসান হাদীছের সমর্থন ও সহযোগিতায় আমলের যোগ্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে। যা উসূলে হাদীছের সর্বসম্মত নীতিমালা।

ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় দলীল হলো হাদীছ। আর হাদীছ দ্বারা শবে বরাতের ফজীলত সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত। তাই কুরআনে শবে বরাতের কথা নেই বলে এর অস্তিত্ব অস্বীকার করার মানেই হলো মহানবী (সঃ) এর হাদীছ অস্বীকার করা। এটা কুরআনের দোহাই দিয়ে হাদীছ অস্বীকার করারই একটি চক্রান্ত।

শবে বরাত ও সাহাবায়ে কেরাম (রঃ)

শবে বরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীছসমূহের বর্ণনাকারীদের মধ্যে অনেক বড় বড় ( এক ডজনের মত ) সাহাবাও রয়েছেন। যাদের কয়েকজনের পবিত্র নাম নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- ক) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রঃ)
- খ) হযরত আলী (রঃ)
- গ) হযরত আয়শা (রঃ)
- ঘ) হযরত আবু হুরায়রা (রঃ)
- ঙ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আ'মর (রঃ)



- চ) হযরত আবু মুসা আশআরী (রঃ)
- ছ) হযরত আউফ ইবনু মালিক (রঃ)
- জ) হযরত মুআয ইবনু জাবাল (রঃ)
- ঝ) হযরত আবু ছালাবাহ আল খুসানী (রঃ)
- ঞ) কাছীর ইবনে মুররা আল হাজরমী (রঃ)

শবে বরাত ও তাবেয়ীঃ

শামের বিশিষ্ট তাবেয়ী যেমনঃ

- ক) হযরত খালেদ ইবনে মা'দান (রহঃ)
- খ) ইমাম মাকহুল (রহঃ)
- গ) লোকমান ইবনে আমের (রহঃ)

প্রমুখ উচ্চমর্যাদাশীল তাবেয়ীগণ শা'বানের পনেরতম রজনীকে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং এতে খুব বেশী বেশী ইবাদত ও বান্দেগীতে মগ্ন থাকতেন বলে গ্রহণযোগ্য মত পাওয়া যায়।

শবে বরাত ও সিহাহ সিভাহঃ

অনেকেই আছেন আমাদের মধ্যে যারা কথায় কথায় সিহাহ সিভার দলীল দেখাতে বলেন এবং সিহাহ সিভাহ ছাড়াও যে হাদীসের আরও বিশাল ভান্ডার আছে, কিতাব আছে যেখানে শত শত সহীহ হাদীস বিদ্যমান, সেগুলোকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে থাকেন। তাদের জ্ঞাতার্থেই বলছি, সিহাহ সিভারই দুটি কিতাব - তিরমিযী শরীফ ও সুনানে ইবনে মাজাহতে শুধু যে শবে বরাত এর ফজীলত সম্পর্কিত হাদীস বর্ণিত আছে তা নয়, বরং ইমাম তিরমিযী (রহঃ) তাঁর তিরমিযী শরীফে এবং ইমাম নাসাঈ (রহঃ) তাঁর সুনানে পনের শাবানের ফজীলত নিয়ে আলাদা বাব বা অধ্যায়ই লিখেছেন।

এর মাধ্যমেই আমরা ইমামদ্বয়ের কাছে শাবানের পনের তারিখের কি পরিমাণ গুরুত্ব ছিল, তা কিছুটা আঁচ করতে পারি।

শবে বরাত ও অন্যান্য হাদীছগ্রন্থঃ

সিহাহ সিভার বাইরেও অনেক ইমামগণ তাদের জগতবিখ্যাত বড় বড় হাদীসগ্রন্থে শবে বরাত ও তার ফজীলত নিয়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন। যেমনঃ

- ১। ইমাম তাবরানী রচিত "আল কাবীর" এবং "আল আওসাত"
- ২। ইমাম ইবনে হিব্বান রচিত "সহীহ ইবনে হিব্বান"
- ৩। ইমাম বায়হাকী রচিত "শুআবুল ঈমান"
- ৪। হাফেয আবু নুআইম রচিত "হিলয়া"
- ৫। হাফেয হায়ছামী রচিত "মাজমাউয যাওয়ায়েদ"
- ৬। ইমাম বাযযার তাঁর "মুসনাদ" এ
- ৭। হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনিযীরী রচিত "আততারগীব ওয়াত-তারহীব"
- ৮। ইমাম আহমদ তাঁর "মুসনাদ" এ
- ৯। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা
- ১০। হাফেয আব্দুর রাজ্জাক এর "মুসান্নাফ" এ

আমরা শবে বরাতের ফজীলত সম্পর্কিত বহু হাদীস দেখতে পাই।

শবে বরাত ও মুফাসসিরে কেরামঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূরা দুখানের তাফসীরে অধিকাংশ যুগবিখ্যাত মুফাসসিরে কেরামের সিদ্ধান্ত এই যে, "লাইলাতুম মোবারকাহ" বলতে "শবে রুদর"ই উদ্দেশ্য, শবে বরাত নয়; যদিও অনেক মুফাসসিরে কেরামই আবার শবে বরাতকেই বুঝিয়েছেন।

কিন্তু এখানে গভীরভাবে লক্ষ্যণীয় যে, যারা এ "লাইলাতুম মোবারকাহ" শব্দের ব্যাখ্যায় 'শবে রুদরকে' প্রাধান্য দিয়েছেন, তারা কেউই কিন্তু শবে বরাত নামক মধ্য-শাবানের রাতের গুরুত্বের ব্যাপারে যে সব হাদীছ বর্ণিত আছে সেগুলোকে ভিত্তিহীন বলে মত প্রকাশ করেননি। বরং তারা শুধুমাত্র উক্ত আয়াতে "লাইলাতুম মোবারকাহ" এর ব্যাখ্যা যে শবে বরাত নয় – শুধু এ কথাটিই ব্যক্ত করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে যে সব তাফসীরবিশারদ উক্ত আয়াতে লাইলাতুম মোবারকাহ এর ব্যাখ্যায় শবেবরাত বলে সাব্যস্ত করেছেন, তারাও কখনও কুরআন অবতরণের রাত্রি, মহা পবিত্র রজনী – শবে রুদর কে গুরুত্বহীন বলে মত পোষণ করেন নি। বরং তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ রাত বলেই সাব্যস্ত করেছেন।

আরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ইসলামী শরীয়তে সত্যিকার অর্থেই যদি শবে বরাত ও এর ফজীলতের কোন অস্তিত্বই না থাকত, শবে বরাতের ফজীলত সম্পর্কিত হাদীসগুলো সবই খুব দুর্বল ও বানোয়াট হত, তাহলে এসব বড় বড় মুফাসসিরে কেরাম সূরা দুখানের তাফসীরগ্রন্থে এ কথাটি অবশ্যই উল্লেখ করতেন যে, শবে বরাত বলতে তো কিছু নেই, তাই লাইলাতুম মোবারকার অর্থ শবে বরাত কখনোই হতে পারে না; এটা ভ্রান্ত আকীদা বা বিদয়াত। কিন্তু তারা কেউই তা উল্লেখ করেননি, শুধুমাত্র বলেছেন লাইলাতুম মোবারকা বলতে এখানে শবে রুদরকে বুঝানো হয়েছে, শবে বরাতকে নয়।

মোট কথা প্রায় সকল তাফসীরবিশারদ শবে রুদরতো মানতেনই, তার সাথে সাথে শবে বরাতকেও অস্বীকার করতেন না। অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম মতকে (শবে রুদর) জোরালোভাবে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি দ্বিতীয় মত তথা শবেবরাতকেও উপেক্ষা করেন নি। বরং তাদের মধ্য থেকে আবার প্রায় সকল মুফাসসির তৃতীয় মতের পক্ষেও দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন।

শবে বরাত ও মুহাদ্দিসীনে কেরামঃ

শবে বরাতের ফজীলত সম্পর্কিত হাদীসগুলোকে মুহাদ্দিসীনে কেরামেরা বরাবরই সনদসহ বিস্তারিত বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার মধ্যে কিছু হাদীসকে সহীহ, কিছুকে হাসান (সহীহের অন্তর্ভুক্ত), আর কিছুকে দুর্বল (কম মাত্রাসম্পন্ন) বলে রায় দিয়েছেন। মুহাদ্দিসগণ যদিও কোন কোন হাদীছের দোষ ত্রুটি আলোকপাত করেছেন কিন্তু কেউ সেগুলোকে ভিত্তিহীন জাল হাদীছ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীছ বলেন নি, এমনকি তারা কোন হাদীসের মতনকেও যঈফ বলেননি। উপরন্তু তারা উসূলে হাদিসের নীতি অনুযায়ী শবে বরাতের ফজীলত আছে বলে মত প্রদান করেছেন এবং এ রাতে সাহাবারা, সলফে সালাহীনরা ইবাদতে মগ্ন থাকতেন বলে তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

এসব মুহাদ্দিসীনদের মধ্যে অন্যতম হলেনঃ

- ১। হাফিয নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল হাইসামী (রহঃ)
- ২। হাফিয ইবনে রজব আল হাম্বলী (রহঃ)
- ৩। ইবনু হিব্বান (রহঃ)
- ৪। আদনান আবদুর রহমান (রহঃ)
- ৫। ইমাম বায়হাকী (রহঃ)



- ৬। হাফিয় যকী উদ্দীন আল মুনিযরী (রহঃ)
- ৭। ইমাম বাযযার (রহঃ)
- ৮। ইমাম উকায়লী (রহঃ)
- ৯। ইমাম তিরমিযী (রহঃ)
- ১০। হামযা আহমাদ আয যায়্যান (রহঃ)
- ১১। ইমাম যুরকানী (রহঃ)
- ১২। আল্লামা ইরাকী (রহঃ) প্রমুখ।

শবে বরাত ও অন্যান্য বুজুর্গানে দ্বীনঃ

উপরে উল্লেখিত সাহাবা, তাবেরীন, মুফাসসিরে কেরাম, মুহাদ্দিসীনরা ছাড়াও অনেক বড় বড় বুজুর্গানে দ্বীনও শবে বরাতের ফজীলত স্বীকার করেছেন এবং এ দিনে অনেক নফল ইবাদত করেছেন। যেমনঃ

- ১। উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ)
- ২। ইমাম আল শাফী (রহঃ)
- ৩। ইমাম আল আওয়ামী (রহঃ)
- ৪। আতা ইবনে ইয়াসার (রহঃ)
- ৫। হাফিয় যয়নুদ্দীন আল ইরাকী (রহঃ)
- ৬। আল্লামা ইবনুল হাজ্ব আল মক্কী (রহঃ)
- ৭। ইমাম সুয়ুতী (রহঃ)
- ৮। ফিকহে হানাফীর ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আলী আল হাসফাকী (রহঃ)
- ৯। ইমাম নববী (রহঃ)
- ১০। হাম্বলী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ফক্বীহ আল্লামা শায়খ মানসূর ইবনু ইউনুস (রহঃ)
- ১১। আল্লামা ইসহাক ইবনুল মুফলিহ
- ১২। আল্লামা ইবনু নুজাইম হানাফী (রহঃ)
- ১৩। আল্লামা হাসান ইবনু আম্মার ইবনু আলী আশ-শারাম্বলালী আল হানাফী (রহঃ)
- ১৪। আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী (রহঃ)
- ১৫। আল্লামা আবুল ফারাজ ইবনুল জাওয়ী
- ১৬। শায়খ আলা উদ্দীন আবুল হাসান আল হাম্বলী (রহঃ)
- ১৭। মোল্লা আলী কারী (রহঃ)
- ১৮। ইমাম গাযালী (রহঃ)
- ১৯। হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জ্বীলানী (রহঃ)
- ২০। ইমাম মুহাম্মদ আল জাযারী (রহঃ)
- ২১। মাওঃ ইসলামুল হক মুযাহেরী (রহঃ)
- ২২। শায়খুল আদব হযরত আল্লামা এযায আলী (রহঃ)
- ২৩। ইমাম আহমাদ (রহঃ)
- ২৪। আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)
- ২৫। মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ)
- ২৬। হাফিয় মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনু আদ্রির রহিম আল মুবারকপুরী (রহঃ)
- ২৭। মুহাদ্দিছুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ)
- ২৮। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)
- ২৯। হযরত মাওলানা মুফতী আজীজুর রহমান সাহেব (রহঃ)
- ৩০। মুফতী আজম মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ)

৩১। তাঁরই ( মুফতী আজম মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ) ) এর সুযোগ্য সন্তান আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উছমানী (দাঃবাঃ)

প্রমুখ সহ আরও অনেক বুজুর্গানে দ্বীন।

শবে বরাত ও কিতাবঃ

মুসলিম বিশ্বের মহামনীষীগণ কুরআন করীমের নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থ, হাদীছের ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং প্রায় বড় বড় আলেম নিজেদের রচিত কিতাবাদীতে কেউ সংক্ষেপিত আকারে কেউ বা সবিস্তারে শবেবরাতের ফজীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁরা যেমন শবেবরাতে করণীয় ও বর্জনীয় দিকসমূহ আপন আপন গ্রন্থে লেখেছেন তেমনি বাস্তব জীবনে রাতটিকে কিভাবে চর্চায় আনা হবে তার নমুনা দেখিয়ে গেছেন।

যেমনঃ

ক) পাঁচশত হিজরীর ইমাম গাযালী (রহঃ) রচিত এহইয়াউ উলুমুদ্দীন ( الدين علوم احياء )

খ) ৬০০ হিজরীর প্রারম্ভে হযরত বড়পীর আব্দুল ক্বাদের জ্বীলানী (রহঃ) এর গুনিয়াতুত তালেবীন ( الطالبين غنية )

গ) ৭০০ হিজরীর ইমাম মুহাম্মদ আল জাযারী (রহঃ) এর আদদোয়াউ ওয়াস সালাত ফী যওইল কুরআন ওয়াস সুন্নাহ ( والسنة القرآن ضوء في الصلوة الدعاء )

ঘ) ৭০০ হিজরীর ইমাম আবু জাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে শারফুদ্দীন নববী (রহঃ) এর রিয়াজুস সালেহীন ( الصالحين رياض )

ঙ) এগারশত হিজরীর শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ) এর মা ছাবাতা বিস সিন্নাহ ( بالسنة ثبت ما )

চ) তেরশত হিজরীর মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহঃ) রচিত মিসফতাহুল জাম্মাহ ( الجنة مفتاح )

ছ) চৌদ্দশত হিজরীর হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এর ওয়াজ ও তাবলীগ ( وتبليغ وعظ )

জ) মুফতী আজম মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ) এর হাকীকতে শবেবরাত ( براءت شب حقيقت )

ঝ) তাঁরই ( মুফতী আজম মুফতী মোহাম্মদ শফী (রহঃ) ) এর সুযোগ্য সন্তান আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উছমানীর (দাঃবাঃ) শবেবরাত ( براءت شب )

ঞ) মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ এর কুরআন-হাদীছের আলোকে শবেবরাত (গবেষণামূলক একটি অনবদ্য রচনা)

সহ অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থে লাইলাতুল বারাত এবং মাহে শাবান প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা শবেবরাতের তাৎপর্য, মাহাত্ম ও মর্যাদার উপর সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে।

শবে বরাত ও সালাফী/আহলে হাদীছঃ

ইদানিং আমাদের কতক সালাফী বা গাইরে মুকাল্লিদ বন্ধুকে দেখা যায়, তারা নানা ধরনের লিফলেট বিলি করেন। তাতে লেখা থাকে যে, শবে বরাত (লাইলাতুল নিসফি মিন শাবান) এর কোন ফযীলতই হাদীস শরীফে প্রমাণিত নেই। অথচ তাদের সবচেয়ে বড় গণ্যমাণ্য ইমাম, অধিকাংশ মাসয়ালা মাসায়েল ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তারা যার উদাহরণ সবচেয়ে বেশি উল্লেখ করে থাকে, শায়খুল ইসলাম আল্লামা ইবনে তাইমিয়াও (রহঃ) শবে বরাতের ফজীলতকে স্বীকার করেছেন। তিনি এও বলেছেন যে, সাহাবারা, তাবঈনরা এবং সালাফরাও (পূর্ববর্তী) এই রাতের বিশেষ মর্যাদা দিতেন।

আবার আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর শিষ্য ইবনে রজব হাম্বলীও (রহঃ) এই রাতের ফজীলতের কথা উল্লেখ করেছেন।

অন্যদিকে হাদীসের তাহকীক তথা বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সালাফী/আহলে হাদীছরা যার সবচেয়ে বেশি ভক্ত, যার কিতবাদি অনুবাদ করে তারা প্রচার করে থাকেন, সময়কালের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ নাসিরউদ্দীন আলবানীও (রহঃ) শবে বরাতের কতিপয় হাদীসকে সহীহ বা হাসান বলেছেন।

ঠিক তেমনি তাঁরই শিষ্য বর্তমান যুগের খ্যাতিমান হাদীছ পর্যালোচক শায়খ শুয়াইব আল আরনাউতুও শবে বরাতের ফজীলত সম্পর্কিত কিছু হাদীসকে সহীহ বা হাসান বলেছেন।

এখন সালাফী বা আহলের হাদীসের ঐসব বন্ধুরা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), শায়খ আলবানী (রহঃ) এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরজ করতে চাই যে, আপনারা যদি শায়খ ইবনে বাযের (রহঃ) অনুসরণে বা নিজেদের তাহকীক মতো এই রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে পারেন তাহলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযীলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সব ধরনের বেদআত রসম-রেওয়াজ পরিহার করে নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন তারাই এমন কি অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা ভুলের সম্ভাবনার উর্ধ্বে নয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং বাতিলপন্থিদের মিশন সফল করতে সহায়তা দেওয়া কি সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি প্রয়োজন? এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আপনারা আপনাদের মতটিকে খুব বেশি হলে একটি ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনায়ুক্তই মনে করেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতটিকে একেবারে ওহীর মতো মনে করেন না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা আর থাকে কি না?

আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) [মৃ. ৭২৮ হিঃ] এর ইক্তিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (রহঃ) [মৃ. ৭৯৫] এর লাতায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায (রহঃ) এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? যা হয়ত তিনি শবে বরাত নিয়ে জাহেল লোকদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, বাড়াবাড়ির প্রতিকার কোন বাস্তব সত্য অস্বীকার করে নয়; বরং সত্য বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

মক্কা-মদীনা নয় , কুরআন-সুন্নাহই অনুসরণীয়

অনেকে আবার মানুষের মনে ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে যে, মক্কা থেকে দীন এসেছে। মদীনা থেকে দীন এসেছে। মক্কা মদীনায় তো শবে বরাত পালন হয় না, তোমরা কোথা থেকে তা পেলে ??

তাদের জবাব হলঃ

রাসূল (সাঃ) মক্কাতে আদর্শ বানাননি। মদীনাকে আদর্শ বানাননি। আদর্শ বানিয়েছেন কিতাবুল্লাহ ও নবীজী সাঃ এর সুন্নাতে। আল্লাহর নবী ইরশাদ করেছেন যে,

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বিষয় রেখে গেলাম, তোমরা ভ্রষ্ট হবেনা যদি এ দু'টি আকড়ে ধরে রাখ। কিতাবুল্লাহ ও নবীর সুন্নত। "

{মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং-১৫৯৪ }

আবার দেখুন ওরা একদিকে বলে যে, কুরআন সুন্নাহ ছাড়া কোন কিছুই দলিল নয়, তাবরাই আবার আরবের উদাহরণ টেনে বলে যে, কই, ওখানে তো শবে বরাত পালন হয় না !! ওদের একাজ কি দোষণীয় নয়?!

আর আমরা হানীফা মায়হাব মেনে চলি বলে হয়ে গেছি মুশরিক, আর ওরা আরবের লোকদের তাকলীদ করে খাঁটি মুমিন থাকে কি করে?

আবার দেখুন কোরআন হাদীসে কোথাও কোন উল্লেখ নেই যে পবিত্র মক্কা মদীনায় সবসময় নবীর সুন্নাহ জিন্দা থাকবে, এটা কিন্তু তাদের নিজেদের আমলের দ্বারাও প্রমাণিত। যেমনঃ হারাম শরীফ ও মসজিদে নববীতে এখনো রমযানে তারাবীহ নামায পড়ানো হয় ২০ রাকাআত, অথচ তারা বলে থাকে ৮ রাকাআত তারাবীহ পড়া সুন্নাহ !! তাহলে এ ক্ষেত্রে তারা কেন মক্কা মদীনাকে অনুসরণ করে না ?? তখন আবার তাদের বক্তব্য হয়, আমরা কোরআন হাদীস মেনে চলি !! আবার তাদের এই বক্তব্যকে যদি ঠিক ধরে নি যে, তারাবীহ ৮ রাকাআত সুন্নাহ (যদিও তা মস্ত বড় ভুল), তাহলে তাদের ভাষ্য অনুযায়ী মক্কা মদীনার ইমামরা এ ক্ষেত্রে সুন্নাহ মানেন না !!

আবার বর্তমান আরবের শায়েখদের আমলই যদি শরীয়ত হয়, তাহলে আরবের অনেক শায়েখ এক সাথে ১৪জন বিবি রাখছে। আপনারা কি তাহলে এটাকে অনুসরণ করবেন? ওদের সিডি দেখিয়ে মানুষকে বলবেন যে, একসাথে ১৪ বিবি রাখা যায়? কারণ সেখানেতু দ্বীন এসেছে মক্কা-মদীনা থেকে তাই ওখানের লোকেরা যা করে সেটাই শরীয়ত??

তার উপর মক্কা মদীনায় যে শবে বরাত কখনো পালন হত না, তাও কিন্তু ঠিক নয়। যেমনঃ

আল্লামা ফাকিহী তদীয আখবারে মক্কা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, অতীত থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত মক্কাবাসী নারী পুরুষগণ শা'বানের মধ্যবর্তী রাতে মসজিদে গমন করেন অতঃপর নামায আদায় করেন, তাওয়াফ করেন, মসজিদে হারামে কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে সারা রাত জেগে থাকেন, এমনকি তারা পূর্ণ কুরআন শরীফ খতম করেন। আর যারা একশ রাকাআত নামায আদায় করেন তারা প্রত্যেক রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে দশবার সূরা এখলাস তিলাওয়াত করেন। যমযমের পানি পান করেন, এর দ্বারা গোসল করেন এবং অসুস্থদের জন্য তা জমা করে রাখেন। এসব আমলের মাধ্যমে তারা উক্ত রাতের বরকত অন্বেষণ করে থাকেন। (আখবারে মক্কা)

মোটকথা, ইসলামের বিধান, কোন জাতি পালন করল কি করল না, তা দিয়ে নির্ধারিত নয়। শরীয়তের দলিল থাকলে তা যে কেউ পালন করতে পারবে। শবে বরাতের আমল কোন আবশ্যকীয় আমল নয়। এটি নফল ইবাদত, আবশ্যিক নয়। কেউ যদি নফল বলে এটাকে ছেড়ে দেয়, তাহলে এ জন্য তাদের অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কোন মানে হয় না। কারণ নফল আমল কেউ ছেড়ে দিলে কোন জবাবদিহীতা নেই। করলে সওয়াব পাবে, নতুবা পাবে না। সুতরাং এ নিয়ে বিভ্রান্তি করা উচিত হবে না।

শেষকথাঃ

পরবর্তী পর্বগুলোতে কোরআন ও হাদীসের আলোকে শবে বরাত ও এর ফজীলত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং যথায়ুক্ত প্রমাণও উপস্থাপন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আজ শায়েখ আলবানী (রহঃ) এর একটি উক্তি দ্বারা শেষ করব, তিনি তাঁর " সিলসিলাতুল আহাদিস সহীহা " কিতাবের (যে কিতাবটিতে তাঁর নিজের ভাষ্যমতে শুধু সহীহ হাদীসগুলোই স্থান পেয়েছে) ৩য় খণ্ডের ১৩৫

থেকে ১৩৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত শবে বরাতের ফজীলত সম্পর্কিত কিছু হাদীসের বিস্তারিত আলোচনা করে সমাপ্তি টানতে গিয়ে বলেনঃ

" যা বর্ণিত শায়েখ কাসেমী থেকে তার প্রণিত “ইসলাহুল মাসাজিদ” গ্রন্থের ১০৭ নং পৃষ্ঠায় জারাহ তা’দীল ইমামদের থেকে যে, “শাবানের অর্ধ মাসের রাতের কোন ফযীলত সম্পর্কে কোন হাদিস নেই মর্মে” সেই বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যাবেনা। আর যদি কেউ তা মেনে নেয় সে হবে ঝাঁপিয়ে পড়া (ঘারতেড়া) স্বভাবের, আর তার ব্যাঙ্গা বিশ্লেষণ ও গবেষণা-উদ্ভাবনের কোন যোগ্যতাই নেই এরকমভাবে যেমন আমি করলাম । "

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সত্যকে সত্য হিসেবে উপস্থাপন করে দাও, যেন তা পালন করতে পারি, আর মিথ্যাকে মিথ্যা হিসেবে উপস্থাপিত করে দাও, যেন এ থেকে বিরত থাকতে পারি।

আমীন।

পর্ব ০৩

### লাইলাতুল বারাত পরিচিতি

১।

বার মাস সম্বলিত আরবী বছরের ৮ম মাস হচ্ছে মাহে শা’ বান। যা রমজানের পূর্ববর্তী সময়ে অবস্থিত। এ শা’ বান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে ফার্সী ভাষায় শবে বরাত বলা হয়। ফার্সীতে শব অর্থ রাত/রজনী; বরাত অর্থাৎ ভাগ্য। শবে বরাত অর্থাৎ ভাগ্যরজনী। আরবী ভাষায়ও বরাত শব্দ ব্যবহৃত হয়। তবে তখন উচ্চারণ হবে বারাত। আর শব শব্দের আরবী অনুবাদ (প্রতিশব্দ) হলো লাইলাতুল। কাজেই ভাষারীতির আলোকে বলতে হবে ليلة البراءة “ লাইলাতুল বারাত ” বা পরিভ্রাণের রজনী।

২।

এ রাতকে কুরআনের ভাষায় (মুফাসসিরীনের একটি দলের মতানুসারে) “ লাইলাতুল মুবারাকাহ ” ( ليلة مباركة ) বরকতময় রাত এবং হাদীছের ভাষায় “ লাইলাতুল নিসফি মিন শাবান ” ( ليلة النصف من شعبان ) অর্থাৎ শাবান মাসের মধ্যরাত্রি বলা হয়।

৩।

তাহসীর গ্রন্থে এর আরো নাম পাওয়া যায়। যেমনঃ

- ক) ( ليلة الرحمة ) লাইলাতুল রাহমাহ অর্থাৎ রহমত অবতীর্ণ হওয়ার রজনী
- খ) ( ليلة الصك ) লাইলাতুলসসাক অর্থাৎ দলীল দস্তাবেজের রজনী
- গ) ( ليلة البراءة ) লাইলাতুল বারাত তথা জাহান্নাম থেকে পরিভ্রাণের রজনী

৪।

মূলতঃ যে বিষয়ে এখানে আলোচনা করতে যাচ্ছি তা –

- ক) বহুসংখ্যক সলফে-সালেহীনের অনেকের অঙ্কিত নাম অনুসারে “ শবে বরাত ”
- খ) কুরআনের ভাষ্য মতে “ লাইলাতুল মুবারাকাহ ”
- গ) মুফাসসিরীনদের ভাষ্য মতে “ লাইলাতুল বারাত ”

ঘ) হাদীসের ভাষ্য মতে “লাইলাতুন নিসফি মিন শা’ বান ” (মধ্য শাবানের রাত্রি)

হিসেবে সুপরিচিত।

৫।

যেহেতু মধ্য এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশ এলাকায় এক সময় ফার্সী ভাষার সর্বাধিক প্রচলন ছিল বিধায় এ পবিত্র রজনীটি ফার্সী ভাষা অনুযায়ী “ শবে বরাত ” নামে সাধারণ মুসলমানদের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ জন্য আমরা এটাকে সাধারণতঃ “ শবে বরাত ” বলে থাকি। কাজেই এখানে একটি বিষয় অতি পরিষ্কার যে, “ শবে বরাত ” আরবী নয় বরং ফার্সী শব্দ। এ জন্য শব্দটি কুরআন ও হাদীছ উভয়ের মাঝে উল্লেখ থাকার প্রশ্নই আসে না। যেমনঃ নামায, রোজা, দরুদ এর ব্যবহার কুরআন হাদীছে ব্যবহৃত হয়নি। বরং তদন্তে সালাত, সিয়াম ইত্যাদি আরবী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি শবে বরাত শব্দটি কুরআনে হাদীছে নেই বলে এটা অমান্য করতে চায় বা বিদআত বলতে চায় তাহলে নামায, রোজা, দরুদ শরীফকেও তাদের বিদআত বলতে হবে। কেননা এসব শব্দ ফার্সী হওয়ায় কুরআন-সুন্নাহ কোথাও ব্যবহৃত হয়নি।

৬।

অতএব নির্দিধায় বলতে হবে, মধ্য এশিয়ার ওলামাদের পরিভাষায় এটা “ শবে বরাত ” হলেও তার আসল নাম –

ক) কুরআনের পরিভাষায় ليلة مباركة “ লাইলাতুম মুবারাকাহ ” (পবিত্র রাত)

খ) হাদীছের পরিভাষায় ليلة النصف من شعبان “ লায়লাতুন নিসফি মিন শা’ বান ” (মধ্য শাবানের রাত্রি)

গ) তাফসীরের ভাষায় ليلة الصك “ লাইলাতুসসাক ” ليلة الرحمة “ লাইলাতুর রাহমাহ ” ليلة البراءة “ লাইলাতুল বারাত ”

কেই বুঝানো হয়েছে। যার কারণসহ বিস্তারিত বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে; ইনশাআল্লাহ।

৭।

আল্লাহ পাক মানবজাতিকে সৃষ্টিকুলের উপর মহাসম্মানে ভূষিত করে বলেছেনঃ

“ অর্থাৎ আমি নিঃসন্দেহে আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি এবং মানব জাতির মধ্যে সকল উম্মতের উপর উম্মতে মুহাম্মাদীর ঈমানদার সম্প্রদায়কে অগণিত নিয়ামত ও বৈশিষ্ট্য দিয়ে ধন্য করেছি। ”

সূরা আর রহমানে বহু নিয়ামত প্রদানের কথা উল্লেখ করে বার বার বলেছেনঃ

فبأي آلاء ربكما تكذبان

“ তোমরা কোন কোন নিয়ামতকে অস্বীকার করবে। ”

৮।

এসব নিয়ামতের মধ্যে অন্যতম নেয়ামত হচ্ছে বিশেষ বিশেষ দিন ও রাতকে মর্যাদা প্রদান করা। এমনিতে ইসলামের তাওহীদী আকীদার দৃষ্টিতে দিন ও রাতের প্রত্যেক মুহূর্তই বরকত ও মর্যাদা প্রাপ্ত। কোন দিন ও রাত ও মুহূর্তকে অকল্যাণকর বলে ধারণা রাখা শরীয়ত পরিপন্থী।



কারণ হাদীছে কুদসীতে হুজুর (সঃ) ইরশাদ করেনঃ

“ যুগ ও সময় আসলে আমি আল্লাহর শানের নাম তাই তাকে গালমন্দ, অভিশাপ দিও না। যুগ-কালের মধ্যে যা কিছু ঘটানো হয় তা আমিই ঘটাই। যুগকে গালমন্দ করার অর্থ হবে আমাকেই গালমন্দ করা। তাই তোমরা তা কখনো করো না। ”

৯।

তবে আল্লাহ তাআলা বরকত ও মর্যাদার দিক দিয়ে কোন কোন মাসকে অন্য মাসের তুলনায়, কোন কোন দিন ও রাতকে অন্য দিন বা রাত্র হতে অধিক মর্যাদাপূর্ণ করেছেন। যেমন পূণ্যবান রজনীগুলোর মধ্যে শবে কুদর, ঈদের রাত্রদ্বয়, জুমার রাত, শবে মেরাজ, শবে বরাতকে অন্যান্য রাত থেকে অধিক বরকতপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। তেমনিভাবে দিনের মধ্য থেকে আরাফার দিন, দুই ঈদের দিন, জুমআর দিন ইত্যাদিকে অন্যান্য দিন হতে অধিক প্রাধান্য ও মর্যাদাপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন।

১০।

বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলা শা’ বান মাস ও তার পনের তারিখের রজনীকে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার জন্য রহমত ও বরকত স্বরূপ ও গুনাহ মার্জনার মৌসুম বলে অভিহিত করেছেন। শবে বরাতও এরই ছোঁয়ায় সমৃদ্ধ। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তাআলা পুরো বছরই শেষ রাতে বান্দার গুনাহ মার্জনা করে থাকেন বলে ‘ হাদীছে-নুযুলে ’ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু শবে বরাত সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, তিনি সূর্যাস্ত থেকে সকাল পর্যন্ত পুরো রাতই বিশেষ রহমত ও ক্ষমার আহ্বান করতে থাকেন। যেমনটি করেন শবে কুদরে। তাফসীর গ্রন্থে বিশেষ দিন-রাত্রের মর্যাদার কারণ হিসেবে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য নবী-রাসূল এর উম্মতগণ হাজার-বারশত বছরের হায়াত পেয়ে দীর্ঘকাল ইবাদত করে জান্নাতের অধিকারী হওয়ার সুযোগ পেতো। কিন্তু উম্মাতে মুহাম্মাদিয়া সাধারণত হায়াত পেয়ে থাকে ৬০ থেকে ৭০ বছর, অথচ এরা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। সুতরাং এ স্বল্প সময়ের ইবাদতকে এরা যেন দীর্ঘ সময়ের ইবাদতের চেয়েও অধিক পূণ্যবান করে সত্যিকার অর্থে শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারেন এ লক্ষ্যে মহান আল্লাহ বিশেষ কিছু সময়, মাস, দিন রাতকে বরকতপূর্ণ করে এমন মর্যাদাশীল করেছেন যাতে এ বিশেষ সময়গুলোতে এ উম্মত তওবার মাধ্যমে আপন গুনাহসমূহ হতে মুক্তি পেতে সক্ষম হয় এবং হাজার হাজার বছর ইবাদত করে জান্নাত অর্জনকারী অন্যান্য উম্মতের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের সুযোগ পায়।

( দেখুন তাফসীরে সূরা কুদর )

শবে বরাতের কয়েকটি নাম ও নামকরণের কারণ

১। লাইলাতুম মুবারাকাহ তথা বরকতপূর্ণ রজনীঃ

কুরআনের ভাষায় একদল মুফসসিরীনের মতানুযায়ী-এটির নাম লাইলাতুম মুবারাকাহ ( ليلة مباركة ) তথা বরকতপূর্ণ রজনী। এ রাতটিকে মোবারাকাহ বলার কয়েকটি কারণ রয়েছে।

ক)

এ রাতে কুরআনুল কারীম লৌহে মাহফুজ থেকে এ দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ করা হয়। অথবা এ রাতে কুরআনুল কারীমের অবতরণের ফায়সালা বা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ঠিক সে বছর রমজান মাসের শবে কুদরেই পবিত্র কুরআন নাযিল শুরু হয়। এ দৃষ্টিকোণে রাতটি বরকতপূর্ণ ও মহাপবিত্র রজনী। তাই একে “ লাইলাতুম মুবারাকাহ ” (বরকতপূর্ণ রজনী) বলে নামকরণ করা হয়েছে।

খ)

এ রাতের প্রারম্ভেই অগণিত ফেরেশতা রহমত ও বরকত নিয়ে অবতীর্ণ হয় এবং রাতব্যাপী জমিনে বিচরণ করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ বান্দাদের উপর রহমত বর্ষণ করতে থাকে। যেমনটি হাদীছে বর্ণিত রয়েছে। তাই রাতটিকে বরকতপূর্ণ রাত বলা হয়।

গ)

এ রজনীতে আল্লাহ তাআলা যমযমের পানির মধ্যে বিশেষ বরকত নাযিল করেন এমনকি বাহ্যিকভাবেও যমযমের পানি বৃদ্ধির মাধ্যমে সে বরকত পরিলক্ষিত হয়। যার বর্ণনা তাফসীর গ্রন্থে বিদ্যমান। যেমনঃ

قيل يزيد في هذه الليلة ماء زمزم زيادة ظاهرة

( হাশিয়াতুত তাফসীরে কাবীরঃ খ-৭, পৃ-৬৯৩ )

## ২। লাইলাতুল নিসফি মিন শা' বান তথা শা' বানের পঞ্চদশ রজনীঃ

হাদীছের ভাষায় লাইলাতুল বারাতাত এর একটি প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে ليلة النصف من شعبان লাইলাতুল নিসফি মিন শা' বান। (এ নামটি ছাড়াও আরো বিভিন্ন নাম হাদীছ গ্রন্থে পাওয়া যায়) যার অর্থ হলো মধ্য শাবানের রাত্রি বা ১৫ই শাবানের রাত। কারণ শবে বরাত সংশ্লিষ্ট সকল-বরকত ফযীলত ও বৈশিষ্ট্যাবলী এ রাতেই অবস্থিত। তাই হাদীছ শরীফে মধ্য-শাবানের রাত, তথা ১৫ই শাবানের রাত দ্বারা সর্বজন পরিচিত শবে বরাতকেই বুঝানো হয়েছে।

## ৩। লাইলাতুল বারাতাতঃ

লাইলাতুল বারাতাত ليلة البراءة বারাতাত শব্দের অর্থ মুক্তি লাভ। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এ রাত্রিতে যেহেতু আল্লাহ তাআলা নেক বান্দাদের এক বৃহৎ দলের গুনাহ মার্ফ করে দিয়ে জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রদান করে দেন। তাই এ রাতটিকে “ লাইলাতুল বারাতাত ” বলে নামকরণ করা হয়েছে। এর প্রমাণ স্বরূপ দুটি কিতাবের উদ্ধৃতি প্রদান করা হলোঃ

ক) ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) বলেনঃ

“ এ রাতকে লাইলাতুল বারাতাত করে এ জন্যই নামকরণ করা হয়েছে যে, টেক্স আদায়কারীগণ জনগণ থেকে পূর্ণ কর আদায় করে তাদেরকে “ বারাতাত ” অর্থাৎ দায়মুক্ত বলে একটি দলীল হস্তান্তর করতেন, তদ্রূপ আল্লাহ তাআ’ লাও মুমিন বান্দাদেরকে - এ রাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তির কথা লিখে দেন । ”

( দেখুন তাফসীরে কবীরঃ খ – ১৪, পৃ – ২৩৯ )

খ) তাফসীরে রুহুল বয়ানে ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) সম্পর্কে একটি চমৎকার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে, প্রমাণস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

“ হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) মধ্য শাবানের রাতে যখন নামাযের সিজদাহ থেকে মাথা উঠান তখন সবুজ রং এর একটি কাগজের টুকরা পেলেন যার নূরের আলো আসমান পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে। তাতে লিখা ছিল “ আল্লাহ পাক তার প্রিয় বান্দা ওমর বিন আব্দুল আযীযকে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত বলে

ঘোষণা দিলেন।” ”

( দেখুন রুহুল বয়ানঃ খ – ৮, পৃ – ৪০৪ )

#### ৪। লাইলাতুসাক তথা সনদের রজনীঃ

শবে বরাতের আরেকটি নাম হাদীছে এসেছে ( ليلة الصك ) “ লাইলাতুসাক ” আভিধানিক অর্থ হলো একরার নামা বা স্বীকারমূলক দলীল দস্তাবেজ। এ নামে নামকরণের কারণ হলো এ পবিত্র রজনীতে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়ার প্রমাণ স্বরূপ জাহান্নাম থেকে মুক্তির সনদ-দলীল জারি করেন।

#### ৫। লাইলাতুর রহমাহ তথা রহমতের রাতঃ

আরেকটি নাম রয়েছে ( ليلة الرحمة ) লাইলাতুর রহমাহ তথা রহমতের রাত। শবেবরাতকে রহমতের রাত হিসেবে এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) হাদীছ শরীফে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের উপর এ রাতে বনুকাল্ব গোত্রের ছাগলের পশম পরিমাণে রহমত নাযিল করেন। অর্থাৎ অসংখ্য বান্দাকে ক্ষমা ও মার্জনা করেন।

( তাফসীরে কাবীরঃ খ-৭, পৃ-৪৪৫ )

শবে বরাতকে এ সব নামে নামকরণ প্রসঙ্গে প্রমাণ স্বরূপ তাফসীরগ্রন্থসমূহ থেকে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) এর তাফসীর কাবীরের বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হচ্ছে। তিনি বলেনঃ

“ মধ্য-শাবানের রাতের আরো চারটি নাম রয়েছে যথাঃ লাইলাতুম মুবারাকাহ , লাইলাতুল বারাতাত, লাইলাতুসাক ও লাইলাতুর রহমাহ ইত্যাদি। ”

( দেখুন তাফসীরে কবীরঃ খ – ১৪, পৃ – ২৩৯ )

#### শেষ কথাঃ

এখানে একটি বিষয় জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, অধিকাংশ মুফাসসিরে কেরামের মতে সূরা দুখানের " লাইলাতুম মুবারাকাহ " এর অর্থ শবে রুদর, শবে বরাত নয়। তবে একদল মুফাসসিরে কেরাম এর অর্থ শবে বরাত করেছেন। তাই তাফসীরগ্রন্থ সমূহে দেখা যায়, যে সব মুফাসসিরে কেরাম এর অর্থ হিসেবে শবে রুদরকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তাদের অধিকাংশই আবার এটা স্বীকার করেছেন যে, অনেক মুফাসসিরে কেরাম এর অর্থ শবে বরাতও করেছেন এবং তাই তারা তাদের নিজ নিজ তাফসীর গ্রন্থে এর উল্লেখও করেছেন। যেমন, উপরে তাফসীরে কাবীরের দলীল দেখানো হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত পরবর্তী পর্ব থেকে শুরু হওয়া " কুরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাত " শীর্ষক প্রবন্ধে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

আজ আমাদের পটিয়া বড় মাদ্রাসার একজন সম্মানিত বুজুর্গের একটি দোআর মাধ্যমে শেষ করব। তিনি মুনাজাতে সব সময় এই দোআটি করতেনঃ

" ইয়া ইলাহি দিল সে মেরে হুসুদ দুনিয়া দূর কর  
ইয়া ইলাহি দিল মে মেরে হুসু তেরে পুর কর "

হে আল্লাহ ! আমার মন থেকে দুনিয়ার মহব্বত দূর করে দাও

হে আল্লাহ ! আমার মনে তোমার মহব্বত পূর্ণ করে দাও।

আমীন।

পর্ব ০৪

## কুরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাত - ১

১।

এ পর্যন্ত যে রাতের ৫টি নাম ও নামকরণের কারণসহ উদ্ধৃত হয়েছে সে লাইলাতুল বারাত তথা শবেবরাত সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমে যে আলোচনা এসেছে সেটা একটু গবেষণা ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ।

২।

এ মহাগ্রন্থের ২৫ তম পারা ও ৪৪ নং সূরা “ দুখানের ” শুরুতে যে পাঁচটি আয়াত রয়েছে সে আয়াতগুলোই লাইলাতুল বারাত বিষয়ক আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তাই আয়াতগুলো প্রথমে অর্থসহ পেশ করা হচ্ছে।

حَم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

“ হা মীম (এ অক্ষরদুটি হরফে মুকাত্তিয়াত বা বিকর্তিত বর্ণ যার অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন) শপথ প্রকাশ্য কিতাবের। নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে আমিই প্রেরণকারী। ”

( সূরা দুখানঃ ১-৫ )

আয়াতে উল্লেখিত لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ লাইলাতুম মুবারাকাহ (বরকতময় রাত) শব্দের ব্যাখ্যা বা তাফসীরকে কেন্দ্র করেই “ কুরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাত ” শীর্ষক আলোচনার সূত্রপাত।

## লাইলাতুম মোবারাকাহ র ব্যাখ্যায় মতানৈক্য

১।

উক্ত لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ লাইলাতুম মোবারাকাহ শব্দটির উদ্দেশ্য ও মর্ম যেহেতু অস্পষ্ট; সুনির্দিষ্ট নয়, তাই শব্দটি দ্বারা কোন রাতকে বুঝানো হলো; এ নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কোন কোন মুফাসসির এ শব্দ থেকে শবেবরাত (মধ্য-শাবানের রাত) বলে আখ্যা দিয়ে এ আয়াত থেকে শবে বরাত প্রমাণিত হয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার অধিকাংশ মুফাসসির এ শব্দ থেকে শবে রুদর অর্থ করে, লাইলাতুম মুবারাকাহ শব্দ দ্বারা রমজানের ঐ পবিত্র রজনী যা সূর্যে রুদরে বর্ণিত আছে – সে রাতকে বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার মুফাসসিরীদের একটি ক্ষুদ্র জামাত এ আয়াতের লাইলাতুম মুবারাকাহ শব্দ থেকে শবে মেরাজ উদ্দেশ্য বলেও মত প্রকাশ করেছেন। এ কারণে সূর্যে দুখানের এ আয়াত নিয়ে প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থে তিন ধরনের মতামত পাওয়া যায়। যেহেতু কুরআনের উক্ত তাফসীরগুলো সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হাদীছের আলোকে করা হয়েছে। তাই মতামতগুলোর মধ্যে কোন মতকেই একেবারে ভ্রান্ত ও বাতিল বলে আখ্যা না দেয়াই হকপন্থী মুসলমানের নীতি বলে আমরা মনে করি। হ্যাঁ নিঃসন্দেহে যে ক্ষেত্রে কুরআনের বর্ণনা অস্পষ্ট সে ক্ষেত্রে মুফাসসিরগণের মাঝে মতপার্থক্য থাকলে কোন একটি মতকে অপর মতের উপর প্রাধান্য দেয়ার অবকাশ অবশ্যই আছে।

সুতরাং এসব তাফসীরের মাঝে বিচার বিশ্লেষণ করলে অভিজ্ঞ আলেমদের নিকট এ কথা সুস্পষ্ট যে, উক্ত আয়াতের লাইলাতুম মুবারাকাহ (বরকতময় রাত) শব্দের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য তাফসীর হলো শবে কদর, শবে বরাত নয়।

২।

তবে এখানে গভীরভাবে লক্ষ্যণীয় যে, যারা এ লাইলাতুম মুবারাকাহ শব্দের ব্যাখ্যা ‘ শবে কদরকে ’ প্রাধান্য দিয়েছেন, তারা কেউ শবে বরাত নামক মধ্য-শাবানের রাতের গুরুত্বের ব্যাপারে এবং শবে মেরাজের ব্যাপারে যে সব হাদীছ বর্ণিত আছে সেগুলো ভিত্তিহীন বলে মত প্রকাশ করেননি বরং তারা শুধুমাত্র উক্ত আয়াতে লাইলাতুম মুবারাকাহ এর ব্যাখ্যা যে শবে বরাত বা শবে মেরাজ নয়— শুধু এ কথাটি ব্যক্ত করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে যে সব তাফসীরবিশারদ উক্ত আয়াতে লাইলাতুম মুবারাকাহ এর ব্যাখ্যায় শবেবরাত বলে সাব্যস্ত করেছেন তারা কখনও কুরআন অবতরণের রাত্রি, মহা পবিত্র রজনী – শবে কদর কে গুরুত্বহীন বলে মত পোষণ করেন নি। বরং তা অধিক গুরুত্বপূর্ণ রাত বলেই সাব্যস্ত করেছেন। ঠিক তেমনিভাবে শবে মেরাজকেও গুরুত্বপূর্ণ রাত বলে বর্ণনা করেছেন।

৩।

মোট কথা প্রায় সকল তাফসীরবিশারদ শবে কদরতো মানতেনই তার সাথে সাথে শবে বরাত ও শবে মেরাজকেও অস্বীকার করতেন না। কেননা এ মর্মে কুরআনের তাফসীরসহ বহু হাদীস বর্ণিত আছে। যদিও সূরা দুখানের আয়াতের ব্যাখ্যা যে শবে বরাত তা অগ্রাধিকারযোগ্য বলে মত পোষণ করেন নি।

ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তিন তাফসীর

সার কথাঃ

সুতরাং দুখানের আয়াতে ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীরে মোট তিনটি মত পাওয়া গেলোঃ

১।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতানুসারে এর ব্যাখ্যা শবেকদর। অন্য কোন রাত দিয়ে এর ব্যাখ্যা সঠিক নয়, কেননা শবেকদর মাহে রমজানেই অবস্থিত। তাই মধ্য শাবানের রাত বা শবে মে’ রাজ (২৭ শে রজবের রাত) এ দুই তাফসীর এখানে অগ্রহণযোগ্য। উপরন্তু এ রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা রয়েছে। আর কুরআন যে শবে কদরে অবতীর্ণ হয়েছে এটা প্রায় চূড়ান্ত। যেমন সূরায়ে কদরে তার বিবরণ রয়েছে।

২।

প্রসিদ্ধ মুফাসসির শায়েখ কামেল আবু মুহাম্মদ সীরাজী (রহঃ) তার স্বীয় তাফসীর গ্রন্থ “ তাফসীরে আরায়েসুল বয়ান ” এ লিখেছেন যে, সূরা দুখানের আয়াত

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ

এর মধ্যে বরকতপূর্ণ রাতের অর্থ হচ্ছে, শবে মেরাজ। তিনি আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে বলেনঃ এভাবে মুবারক রাতের অর্থ হলো, শবে মেরাজ, যে রাতে আল্লাহর হাবীব (সঃ) স্বীয় বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হন। রাতটি রসূল (সঃ) এর জন্য বরকতপূর্ণ এ ভাবে যে, এ রাতে তিনি আল্লাহকে দেখতে পেয়েছেন এবং আল্লাহ তার কলবের উপর কুরআন অবতীর্ণ করেছেন।

( দেখুন তাফসীরে আরায়েসুল বয়ানঃ খ – ২, পৃ – ৪৪৪, সূত্র শবে বরাত কেয়া হায়, মাওলানা ইসলামুল হক )

৩।

তৃতীয় তাফসীর হলো, সূরায় দুখানের এ আয়াতের তাফসীর হলো শবে বরাত। মতটি হযরত ইকরামাহ ও ক্বাতাদাহসহ অনেকে গ্রহণ করেছেন। এ মতের পক্ষে জোরালো যুক্তি হলো, এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাময় বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পৃথক করণের কথা কুরআনে বলা হয়েছে অর্থাৎ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিস্তারিতভাবে সুনির্ধারণ ও সুনির্দিষ্ট করে দেয়া এবং কোন বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কি সিদ্ধান্ত তা সংশ্লিষ্টদের নিকট হস্তান্তর করা প্রভৃতি সম্পন্ন করে দেয়া হয়, যার বিবরণ হাদীছ শরীফে সবিস্তারে এসেছে।

৪।

এ তিনটি মতামতের মধ্যে দ্বিতীয় মতের উপর শুধু আল্লামা সিরাজীর উল্লেখিত উদ্ধৃতি ছাড়া তেমন কোন দলীল-প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাই তাফসীরকারকগণ মতটিকে উল্লেখ করতে দেখা যায় না।

কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় মত অধিকারে তাফসীর গ্রন্থসমূহে বর্ণিত রয়েছে অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম মতকে জোরালোভাবে উল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি তৃতীয় মত তথা শবেবরাতকেও উপেক্ষা করেন না। বরং তাদের মধ্য থেকে প্রায় সকল মুফাসসির তৃতীয় মতের পক্ষেও দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন। কেবল হাতেগোনা দু' একজন মুফাসসির সঠিক থেকে বহুদূরে ( بعد ) অথবা ( بيشئ ليس ) তেমন ওজনী নয় ইত্যাদি শব্দ দ্বারা মন্তব্য করেছেন। তাই মতদ্বয়ের কিছু বিস্তারিত বিবরণ প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থসমূহ থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

মুফাসসিরীনদের দৃষ্টিতে ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীর শবে ক্বদরের পাশাপাশী শবে বরাতও বটে

১।

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে যেহেতু ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীর শবে ক্বদর বিধায় বলা যায়, এটিই প্রায় সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। সুতরাং এর পক্ষের প্রমাণাদি এখানে উল্লেখ করার তেমন প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেহেতু বর্তমান বিশ্বের কিছু কিছু আলেম সূরা দুখানের আয়াতে ( ليلة مباركة ) লাইলায়ে মুবারাকাহ এর মধ্যে শবে বরাত বা শবে মেরাজ নিয়ে আলোচনা করার কোন অবকাশই নেই বলে মত ব্যক্ত করে থাকেন এবং কেউ এ রকম ব্যাখ্যা দিলে তাকে ভ্রান্ত, ভ্রষ্ট আখ্যায়িত করে বিরোধিতায় লিপ্ত হন, বিধায় এখানে কেবল ঐ সব তাফসীরের উদ্ধৃতি পেশ করছি যেখানে লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীর মধ্য-শাবানের রাত তথা ' শবেবরাত ' দ্বারাও করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যেন ঐসব ফেৎনাবাজের অজ্ঞতা মূর্খতা সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে যায়।

### তাফসীরগ্রন্থ

এখানে যেসব তাফসীরগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া হবে তা হলঃ

১। তাফসিরে কবীর

২। তাফসীরে রুহুল মায়ানী

৩। তাফসীরে রুহুল বায়ান



- ৪। তাফসীরে কুরতুবী
- ৫। তাফসীরে তবরী
- ৬। তাফসীরে বগবী
- ৭। তাফসীরে খাযেন
- ৮। তাফসীরে ইবনে কাছীর

এখানে উল্লেখ্য যে, যেসব মুফাসসিরে কেলাম ليلة مباركة এর ব্যাখ্যায় শবে কদরকে বুঝিয়েছেন, শবে বরাতকে নয়, তারা কিন্তু তাই বলে কেউই শবে বরাতকে অস্বীকার করেন নি কখনো। বরং হাদীসের দলীল দ্বারা তারা অনেকেই শবে বরাত এবং এর ফাযায়েল বর্ণনা করেছেন। আর লক্ষ্যণীয় বিষয়টি হলো, যদি শবে বরাতের কোন অস্তিত্বই ইসলামী শরীয়াতে না থাকত তাহলে যেসব মুফাসসিরে কেলাম শবে কদর বুঝিয়েছেন, তারা স্পষ্টভাবে নিশ্চয়ই তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করতেন যে, শবে বরাত বলতে তো কিছু নেই, তাই এ ব্যাখ্যা কখনো হতে পারে না বা এটি বিদআত !! কিন্তু তারা কেউই এ কথা উল্লেখ করেন নি শুধু বলেছেন যে ليلة مباركة এর অর্থ শবে কদর, শবে বরাত নয়।

#### প্রথম তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে কবীর

১।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রহঃ) তার সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ তাফসীরে কাবীরে সূরা দুখানের আয়াতে (ليلة مباركة) লাইলাতুম মুবারাকাহ দ্বারা কোন রাত্রি বুঝানো হল, এ ব্যাপারে উল্লেখ করেনঃ

“ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেলামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশের মতে এটি হলো লাইলাতুল কদর তথা শবে কদর আর হযরত ইকরমা (রহঃ) সহ অপর একদল আলেমের মতে এ রাত্রি হলো শবে বরাত আর তা হলো লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান। (মধ্য শাবানের রাত্রি) ”

( তাফসীরে কবীরঃ খ – ১৪, পৃ – ৩৩৮ )

২।

অতঃপর ইমাম রাযী (রহঃ) প্রথম মতের পক্ষে সবিস্তারে দলিল উল্লেখ করার পর বলেনঃ

“ (অতঃপর) যারা এ আয়াতের ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর অর্থ শবে বরাত করেছেন তাদের দৃষ্টিতে শাবানের মধ্য রাতের চারটি নাম প্রসিদ্ধ রয়েছে যথাঃ লাইলাতুম মুবারাকাহ, লাইলাতুল বারাতাত, লাইলাতুস্‌সক ও লাইলাতুর রহমাহ। বলা বাহুল্য যে, লাইলাতুল বারাতাত এই জন্যই নামকরণ করা হয়েছে যে, টেক্স আদায়কারী, জনগণ থেকে পূর্ণ কর আদায় করে নেয়ার পর তাদেরকে “ বারাতাত ” (অর্থাৎ দায়মুক্ত) লিখে দিতেন। তদ্রূপ আল্লাহ তাআলাও মুমিন বান্দাদেরকে এ রাত্রিতে ক্ষমা মার্জনা করে জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্ত বলে লিখে দেন তাই এ রাতকে শবেবরাত বলা হয়। ”

( তাফসীরে কবীরঃ খ – ১৪, পৃ – ২৩৯ )

#### দ্বিতীয় তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে রুহুল মাআনী

আল্লামা আলুসী (রহঃ) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে রুহুল মাআনীতে উল্লেখ করেছেনঃ

“ এবং হযরত ইকরামা ও আরো একদল মুফাসসিরীনেকেরাম বলেন যে, এ রাতটিই হলো শাবানের মধ্য রাত অর্থাৎ শবে বরাত। যার নাম রাখা হয়েছে, লাইলাতুররহমাহ, লাইলাতুমমুবারাকাহ, লাইলাতুসসক (দায়মুক্তির রাত) এবং লাইলাতুল বারাত (মুক্তি প্রাপ্তির রাত) দিয়ে যারা এ রাতকে লাইলাতুল বারাত দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন, তারা এর মর্যাদা সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, যা ইমাম ইবনে মাজাহ ও ইমাম বায়হাকী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ শুয়াবুল ঈমানে হযরত আলী (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেনঃ যখন মধ্য-শাবানের মধ্যরাত হবে তোমরা রাতভর ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যাও এবং দিনে রোযা রাখ, কেননা আল্লাহ তাআলা এ রাত্রে সূর্যাস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, আর আহ্বান করতে থাকেন, কে আছ ক্ষমা প্রার্থনাকারী? আমি তাকে ক্ষমা করে দেব, কে আছ রিযিক প্রার্থী? আমি তাকে রিযিক দান করব, কে আছ যাচনাকারী? আমি তাকে দান করব। কেউ কি এরূপ আছ? কেউ কি এরূপ আছ? এভাবে ফজর পর্যন্ত আহ্বান করতে থাকেন। ”

(তাফসীরে রুহুল মাআনীঃ খ – ৯, পৃ – ১১০ অংশ ১২ )

### শেষ কথাঃ

যেহেতু অধিকাংশ মুফাসসিরীনে কেরামের মতে লাইলাতুম মুবারাকাহ এর অর্থ শবে কদর তাই এই মতই অধিক গ্রহণযোগ্য। তবে মুফাসসিরীনের এক জামাতাত এর অর্থ শবে বরাতও করেছেন বিধায় কেউ লাইলাতুম মুবারাকাহ এর অর্থ শবে বরাত করলে তাকে ভ্রান্ত বলার কোন অবকাশ নেই এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ সামনে আরও আসবে ইনশাআল্লাহ এখানে লক্ষ্য করুন, সারা বিশ্বের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় দুটি তাফসীর গ্রন্থ যথা তাফসীরে কাবীর এবং তাফসীরে রুহুল মাআনী - উভয় কিতাবের মুফাসসির কিন্তু কেউই শবে বরাতকে অস্বীকার করেন নি, বরং শবে কদরের পাশাপাশি লাইলাতুম মুবারাকার অর্থ শবে বরাতকেও যে অনেক মুফাসসিরে কেরাম উল্লেখ করেছেন, তাই তারা তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন এবং এর ফাযায়েল সম্পর্কে হাদীসও বর্ণনা করেছেন। আরও লক্ষ্যনীয় যে, হাদীস বর্ণনা করার পর তারা কেউই হাদীসগুলোকে জাল বলেন নি, বা শবে বরাতের অস্তিত্বকেও অস্বীকার করেন নি। যদি ইসলামী শরীয়তে শবে বরাতের কোন অস্তিত্বই না থাকত, তাহলে এসব জগতবিখ্যাত মুফাসসিরে কেরাম তাদের কিতাবে এ কথা অবশ্যই উল্লেখ করতেন যে, শবে বরাত বলতে তো কিছু নেই, অতএব এখানে শবে বরাতের প্রসঙ্গ আসবে কোথা থেকে ? তারা কিন্তু কেউই সেরকম কোন উক্তি করেন নি। তাই কাউকে ভ্রান্ত বলার আগে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, আমরা নিজেরাই ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি কি না ?

আজ শেষ করব পবিত্র কোরআনের শুরুতেই মহান রব্বুল আলামীন আমাদের যে দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন, তা দিয়েঃ

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

আমাদেরকে সরল পথ দেখাও

সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ

তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে

আমীন।

.....

পর্ব ০৫

## কুরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাত - ২

এ মহাগ্রন্থের ২৫ তম পারা ও ৪৪ নং সূরা “ দুখানের ” শুরুতে যে পাঁচটি আয়াত রয়েছে সে আয়াতগুলোই লাইলাতুল বারাত বিষয়ক আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তাই আয়াতগুলো প্রথমে অর্থসহ পেশ করা হচ্ছে।

حَم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

“ হা মীম (এ অক্ষরদুটি হরফে মুকাত্তিয়াত বা বিকর্তিত বর্ণ যার অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন) শপথ প্রকাশ্য কিতাবের। নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে আমিই প্রেরণকারী। ”

( সূরা দুখানঃ ১-৫ )

আয়াতে উল্লেখিত **লাইলাতুল মুবারাকাহ** (বরকতময় রাত) শব্দের ব্যাখ্যা বা তাফসীরকে কেন্দ্র করেই “ কুরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাত ” শীর্ষক আলোচনার সূত্রপাত।

আমরা গত পর্বে বিশ্ববিখ্যাত ও সর্বজননন্দিত দুটি তাফসীর গ্রন্থ যথা তাফসীরে কাবীর ও তাফসীরে রুহুল মাআনী থেকে এ আয়াত সমূহের তাফসীর আলোকপাত করেছিলাম এবং মুফাসসিরে কেরামের এক জামাআত এর তাফসীরে শবে রুদরের পাশাপাশি শবে বরাতও করেছিলেন, তার প্রমাণও উল্লেখ করেছিলাম।

এই পর্বে আমরা আরও কিছু যুগ প্রসিদ্ধ ও সর্বজনগ্রাহ্য কিছু তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

## তৃতীয় তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে রুহুল বায়ান

আল্লামা ইসমাঈল হক্কানী (রহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থ রুহুল বায়ানে **লাইলাতুল মুবারাকাহ** শব্দ দ্বারা কোন রাতটিকে বুঝায়, এ নিয়ে বিশেষ আলোচনা করতঃ এক দল মুফাসসিরীদের দৃষ্টিতে এ রাত থেকে লাইলাতুল বারাত বুঝানো হয়েছে মর্মে বর্ণনা করার পর লিখেনঃ

“ কোন কোন তাফসীরকারক এখানে লাইলাতুল মুবারাকাহ থেকে মধ্য-শাবানের রাত বুঝিয়েছেন। এ রাতে আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য “ বারাত ” নির্ধারণ করেন। যথাঃ বর্ণিত আছে যে, **হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ)** এ রাতে যখন নামায থেকে মাথা উঠিয়েছেন তখন একটি সবুজ রং এর কাগজ (হাতে) পেলেন যার নূরের রস্মি আসমান পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। সেখানে লিখা ছিল “ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দা ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের জন্য জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তির ঘোষণা দেয়া হলো। ” এবং এ রজনীতে নেক বান্দাদেরকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি থেকে মুক্তি দেয়া হয়, অনুরূপভাবে বদকার বান্দাদের আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত বলেও ঘোষণা দেয়া হয়। এ রজনীর আরো বহু বৈশিষ্ট্য রয়েছে ”

( রুহুল বায়ানঃ খ – ৮, পৃ – ৪০৪ )

অতঃপর আল্লামা ইসহাক হক্কানী (রহঃ) শবে বরাতের প্রায় ছয়টি বৈশিষ্ট্য সবিস্তারে বর্ণনা করেন তাঁর এ তাফসীরে।

## চতুর্থ তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে কুরতুবী

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তাঁর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ জামিউল আহকামিল বয়ান এ উল্লেখ করেনঃ

“ বরকতময় রাত্রি বলতে রুদরের রাতকে বুঝানো হয়েছে। কেউ বলেছেন, সেটা মধ্য শা’ বানের রাত। এবং এ রজনীর আরো চারটি নাম রয়েছে। যেমন লাইলাতুমমুবারাকাহ, লাইলাতুলবারাআত, লাইলাউস্‌সক, লাইলাতুররহমাহ। হযরত ইকরামা বলেছেন, এ আয়াতে লাইলাতুম মুবারাকাহ অর্থ মধ্য শাবানের রাত্রি। তবে প্রথম মতটি অধিক শুদ্ধ।

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

অর্থাৎ আমারই নির্দেশক্রমে উক্ত রাতে প্রতিটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ে ফয়সালা করা হয়।

ইবনে আব্বাস (রঃ) বলেনঃ এর অর্থ দুনিয়াবী প্রজ্ঞাসম্পন্ন বস্তুর ফয়সালা আগামী রুদরের রাত পর্যন্ত গৃহীত হয়।

হযরত ইকরামা বলেনঃ এ প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের ফয়সালা মধ্য শা’ বানের রাতেই করা হয় এবং পূর্ণ বছরের যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা হয়। জীবিতদেরকে মৃত্যুবরণকারীদের থেকে পৃথক করা হয়। ”

( তাফসীরে কুরতুবীঃ খ – ১৬, পৃ – ৮৫ )

### একটি প্রশ্ন

উল্লেখ্য ইমাম কুরতুবী (রহঃ) তার স্বীয় গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবীর উদ্ধৃতিও পেশ করেছেন যে, তিনি বলেছেনঃ যারা ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ দ্বারা মধ্য শাবানের রাত্রি বলে বুঝেন, তাদের এ মতটি বাতিল বলে গণ্য। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর অকাট্য বাণী কুরআনে বলেছেন, রমজান হচ্ছে ঐ মাস যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে, আর যে রাতে কুরআন অবতরণ করেছেন সূরা রুদরে সেটিকে লাইলাতুল রুদর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অতএব এ আয়াতেও যে মোবারক রাতে কুরআন নাযিল করার কথা বলা হয়েছে – এর ব্যাখ্যাও রমজানের সে পবিত্র রাত্রিই ধর্তব্য হবে, যার নাম হবে রুদর।

( দেখুন কুরতুবীঃ খ – ১৬, পৃ – ৮৫ )

### তার সঠিক উত্তর

উপরোক্ত বক্তব্যটি কুরতুবীতে উল্লেখ থাকলেও সেটা ইমাম কুরতুবীর মতামত নয়। কেননা তার মতামত সুস্পষ্টভাবে তিনি পূর্বেই উল্লেখ করেছেন, أصح والأول অর্থাৎ প্রথম মতটি অধিক সহীহ। এর অর্থ দ্বিতীয় মতকে ভ্রান্ত বা ভুল বলা চলবে না। বরং সেটি صحيح তথা ‘ সঠিক ’ বলে গণ্য হবে। কেননা অধিক সঠিকের বিপরীতটা যে শুধু সঠিক হয় তা ওলামায়ে কেরামের নিকট স্বীকৃত সুতরাং ইবনুল আরাবীর মতানুসারে এটিকে বাতিল বলা (যাবে না)। কারণ এটা তার একক মতামত, অন্য কেউ তা গ্রহণ করেননি।

### পঞ্চম তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে তবরী

ইমাম আবু জাফর মুহাম্মাদ ইবনে জাবীর তাবারী (রহঃ) তার প্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেনঃ

“ লাইলাতুমমুবারাকাহ এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে তাফসীরকারকগণের মতভেদ রয়েছে যে রাতটি বছরের কোন রাত? কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ শবে কদর (অতঃপর তাদের দলীল পেশ করেছেন) এবং অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেছেনঃ রাতটি মধ্য-শা’ বানের রাত।

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

“ সে রাতে সকল প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের ফয়সালা করা হয়। ”

এ আয়াতেও সে ‘ রাত ’ বলতে কোন রাত বুঝানো হয়েছে, এ বিষয়েও মুফাসসিরগণের মতভেদ রয়েছে (যেমন মতভেদ ছিল مباركة ليلة লাইলাতুমমুবারাকার মধ্যে)

কেউ কেউ বলেছেনঃ এ আয়াতেও রাত থেকে শবে কদরকে বুঝানো হয়েছে আবার কারো কারো মতে এ আয়াতেও শবে বরাতকে বুঝানো হয়েছে ”

( তাফসীরে তবরীঃ খ – ১১, পৃ – ২২১-২২২ )

ইমাম ইবনে জারীর প্রত্যেক মতের স্বপক্ষে বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন— যা এখানে উল্লেখ করার অবকাশ নেই।

### ষষ্ঠ তাফসীর গ্রন্থ তাফসীরে বগবী

ইমাম বাগাভী (রহঃ) তার স্বীয় তাফসীরে বাগাভীতে উল্লেখ করেনঃ

“ লাইলাতুমমুবারাকাহ সম্পর্কে কাতাদাহ, ইবনে জায়েদ (রহঃ) বলেছেন যে, এটা কদরের রাত। তবে অন্যান্য মুফাসসির বলেছেন, লাইলাতুম মুবারাকাহ এর অর্থ মধ্য-শাবানের রাত। এবং হযরত ইকরামা (রহঃ) বলেছেনঃ মধ্য-শাবানের রাত , যাতে পূর্ণ বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করা হয়। ”

( তাফসীরে বাগাভীঃ খ – ৪, পৃ – ১১১ )

### শেষ কথাঃ

উপরোক্ত সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ সমূহ ভাল মত অধ্যয়ন করলে, এ কথা দিবালাকের মত পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, লাইলাতুম মুবারাকার তাফসীরে মুফাসসিরে কেলাম শবে বরাতও উল্লেখ করেছেন। তাই এসব তাফসীরগ্রন্থসমূহে উভয় মতের কথা অর্থাৎ শবে কদর ও শবে বরাত - উভয় মতের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাফসীর বিশারদগণ শুধু উল্লেখই করেন নি, বরং প্রত্যেক মতের স্বপক্ষে দলীলও পেশ করেছেন।

তাই কেউ যদি বলে যে উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা শবে বরাত বুঝানো যাবে না কিংবা কোন মুফাসসিরে কেলাম উক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা শবে বরাত বুঝানো নি বা এটা তাফসীর বিরায় (মনগড়া তাফসীর) তাহলে সে যেমন মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য দায়ী থাকবে ঠিক তেমনি কেউ যদি কোরআনের এই আয়াতসমূহের তাফসীরে শবে কদরকে অগ্রাধিকার দিয়ে কোরআনে শবে বরাত নেই বলে শবে বরাতের ফযীলতকেই অস্বীকার করে বসে, সেও হাদীস অস্বীকারকারী তথা ইসলামী শরীয়ত অস্বীকারকারী বলে পরিগণিত হবে, কারণ শবে বরাতের ফযীলত সহীহ হাদীস এবং উসূলে হাদীসের নীতিমালা দ্বারা প্রমাণিত

তাই কাউকে ভ্রান্ত বলার আগে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে আমরা নিজেরাই ভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছি কি না?

আজ পবিত্র কোরআনের দ্বিতীয় সূরা, সূরা বাকারার ৮ এবং ৯ নং আয়াত পেশ করে শেষ করব ইনশাআল্লাহ।

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ  
يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনেছি অথচ আদৌ তারা ঈমানদার নয়। তারা আল্লাহ এবং ঈমানদারগণকে ধোঁকা দেয়। অথচ এতে তারা নিজেদেরকে ছাড়া অন্য কাউকে ধোঁকা দেয় না, অথচ তারা তা অনুভব করতে পারে না।

আসুন আগে আমরা সবাই একটু যাচাই করে নিই, আমরা এসব লোক দেখানো ধোঁকাবাজ ঈমানদারদের অনুসরণ করছি না কি হক্কানী ঈমানদারগণের অনুসরণ করছি।

আল্লাহ আমাদের এসব বাতিল ফিরকা থেকে হেফাজত করুন।

আমীন।

পর্ব ০৬

কুরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাত - ৩

এ মহাগ্রন্থের ২৫ তম পারা ও ৪৪ নং সূরা “ দুখানের ” শুরুতে যে পাঁচটি আয়াত রয়েছে সে আয়াতগুলোই লাইলাতুল বারাত বিষয়ক আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তাই আয়াতগুলো প্রথমে অর্থসহ পেশ করা হচ্ছে।

حَم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

“ হা মীম (এ অক্ষরদুটি হরুফে মুকাত্তিয়াত বা বিকর্তিত বর্ণ যার অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন) শপথ প্রকাশ্য কিতাবের। নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে আমিই প্রেরণকারী। ”

( সূরা দুখানঃ ১-৫ )

আয়াতে উল্লেখিত **لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ** লাইলাতুম মুবারাকাহ (বরকতময় রাত) শব্দের ব্যাখ্যা বা তাফসীরকে কেন্দ্র করেই “ কুরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাত ” শীর্ষক আলোচনার সূত্রপাত।

আমরা এর আগের দুটি পর্বে বিশ্ববিখ্যাত ও সর্বজননন্দিত ছয়টি তাফসীর গ্রন্থ যথা তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে রুহুল মাআনী, তাফসীরে রুহুল বায়ান, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে তবরী, তাফসীরে বগবী প্রভৃতি থেকে এ আয়াত সমূহের তাফসীর আলোকপাত করেছিলাম এবং মুফাসসিরে কেরামের এক জামাআত এর তাফসীরে শবে কদরের পাশাপাশি শবে বরাতও করেছিলেন, তার প্রমাণও উল্লেখ করেছিলাম।

এই পর্বে আমরা আরও দুটি যুগ প্রসিদ্ধ ও সর্বজনগ্রাহ্য কিছু তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

সপ্তম তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে খাযেন

ইমাম খাযেন (রহঃ) তার তাফসীর গ্রন্থে লাইলাতুম মুবারাকাহ এর সম্পর্কে উল্লেখ করেনঃ



“ হযরত ইবনে জায়েদ (রহঃ) বলেনঃ লাইলাতুমমুবারাকাহ তা হলো শবে রুদর। অন্যান্য তাফসীরকারক বলেছেনঃ রাতটি মধ্য শাবানের রাত। এবং হযরত ইকরামা (রঃ) বলেন রাতটি মধ্য-শাবানের রাত যেখানে পূর্ণ বৎসরের গুরুত্বপূর্ণ সব বিষয়ের ফয়সালা হয় এবং জীবিত ব্যক্তিদেরকে মৃত ব্যক্তিদের থেকে পৃথক করা হয়। ”

( তাফসীরে খায়েনঃ খ – ৪, পৃ – ১৪৩ )

### অষ্টম তাফসীরগ্রন্থ তাফসীরে ইবনে কাছীর

ইমাম ইবনে কাছীর (রহঃ) তার স্বীয় গ্রন্থ তাফসীরে কুরআনুল আযীমে উল্লেখ করেছেনঃ

“ বরকতময় রাত বলতে শবে রুদরকে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি কুরআনে করীম শবে রুদরে নাযিল করেছি এবং কুরআন রমজান মাসেই নাযিল করেছি। আর যারা বলেন, বরকতময় রাত বলতে মধ্য শা' বানের রাতকে বুঝানো হয়েছে – যেমনটি ইকরামাহ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে – তাদের কথা সত্য থেকে বহু দূরে এবং যে হাদীছটি উছমান ইবনে আখনাস থেকে বর্ণিত অর্থাৎ “ এক শাবান মাস হতে অন্য শাবান মাস পর্যন্ত মানুষের হায়াত মাউত ও রিযিকের বার্ষিক ফয়সালা হয়ে থাকে এমনকি কোন লোক বিবাহ করে এবং বাচ্চাও জন্ম গ্রহণ করে অথচ সে জানে না তার নাম মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। ” এ হাদীছটি মুরসাল (অর্থাৎ হাদীছটিতে রসূল (সঃ) থেকে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নেই।) এ ধরনের হাদীছ দ্বারা সহীহ হাদীছকে খন্ডন করা যায় না। ”

( তাফসীরে ইবনে কাছীরঃ খ – ৪, পৃ – ১৪৮ )

### ইবনে কাছীরের মন্তব্যের পর্যালোচনা

উল্লেখ্য, ইমাম ইবনে কাছীর তাঁর উপরোক্ত বক্তব্যে বরকতময় রাতের ব্যাখ্যা যাঁরা মধ্য-শাবানের রাত দিয়ে করেছেন তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে তাঁদের মতটিকে সঠিক থেকে দূরে বলে মন্তব্য করেছেন মাত্র। অতঃপর এদের দলীল সম্পর্কে যে উক্তি পেশ করেছেন (অর্থাৎ হাদীছটি মুরসাল) এর দ্বারা দলীলটি অগ্রহণযোগ্য হওয়ার প্রমাণ বহন করে না। কেননা হাদীছ বিশারদগণ ভাল করেই জানেন যে, অনেক ফকীহ ও হাদীছের ইমামগণের নিকট মুরসাল হাদীছ গ্রহণযোগ্য। আমাদের মাযহাবের ইমাম ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)ও এদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং হাদীছটির ব্যাপারে ইবনু কাছীরের এ মন্তব্য কতটুকু সঠিক, তা আমরা “ শবে বরাত হাদীছের আলোকে ” শীর্ষক শিরোনামে সবিস্তারে পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

### মোটকথা

এ পর্যন্ত যে সব তাফসীর গ্রন্থের উদ্ধৃতি পেশ করা হলো, তাতে ليلة مباركة লাইলাতুমমুবারাকাহ শব্দের প্রথম মর্মার্থ তথা শবে রুদর এর পাশাপাশি দ্বিতীয় মর্মার্থ তথা শবে বরাত সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হল। এতে প্রমাণিত হয় যে, অধিকাংশ তাফসীরবিশারদের মতে ليلة مباركة লাইলাতুমমুবারাকাহ শব্দের ব্যাখ্যা যেমনিভাবে ‘ শবে রুদর ’ (যা রমজান মাসেই অবস্থিত) হতে পারে অনুরূপভাবে ‘ শবে বরাত ’ ও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তবে শবে রুদর দিয়ে ব্যাখ্যা করা অধিক গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে মুফাসসিরে কুরআনের তেমন দ্বিমত নেই হেতু তাফসীরে ইবনে কাছীর, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে তাবারী ইত্যাদি গ্রন্থে রুদরের মতটিকে জোরালো ভাষায় পেশ করা হয়েছে যা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। এ মতটি তাফসীরে আদওয়াউল বয়ানে আল্লামা মুহাম্মদ আমীন শীনকীতী এবং তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে আল্লামা মুফতী শফী সাহেব (রহঃ)ও বর্ণনা করেছেন।

ليلة مباركة লাইলাতুমমুবারাকাহ এর অর্থ যে শবেবরাতও হতে পারে এবং যা আয়াতের আরেকটি প্রসিদ্ধ

ব্যাখ্যাও বটে তা কিন্তু কেউই অস্বীকার করেন নি। বরং সম্ভাব্য ও প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা হিসেবে সকলেই তা উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং কেউ যদি ليلة مباركة লাইলাতুমমুবারাকাহ এর অর্থ শবে বরাত দিয়ে করাকে ভ্রান্ত তাফসীর বলে মত পোষণ করেন পক্ষান্তরে সে সকল মুফাসসিরের তাফসীরকে যে উপেক্ষা করলো বা ভ্রান্ত বলল— এতে যেমন কোন সন্দেহ নেই, তেমনিভাবে ইসলামী বিধানশাস্ত্র সম্পর্কে সে যে অজ্ঞ তাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই।

তাই আমাদের বক্তব্য হলো — যদি কেউ উপরোক্ত তাফসীর গ্রন্থসমূহের আলোকে সূরা দুখানে উদ্ধৃত ليلة مباركة লাইলাতুমমুবারাকাহ এর তাফসীর শবে বরাত দ্বারা করেন, তাহলে এ ব্যাখ্যা কোনক্রমেই বাতিল বা ভ্রান্ত বলার সুযোগ নেই। বরং এদের মতকেও শ্রদ্ধার সাথে মূল্যায়ন করা ঈমানী কর্তব্য।

তবে হ্যাঁ ليلة مباركة লাইলাতুমমুবারাকাহ এর এধরণের বিরোধপূর্ণ তাফসীরদ্বয়ের মধ্যে কোন মীমাংসা পাওয়া যায় কি না অথবা কোন তাফসীর অধিক গ্রহণযোগ্য— এ নিয়ে অবশ্যই আলোচনা হতে পারে। প্রথম মতটি অধিক গ্রহণযোগ্য বলা হলে তাতে কোন আপত্তি থাকবে না, যেমন বিভিন্ন তাফসীরে কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীছের কিছু বিবরণের সাহায্যে এরূপই বলা হয়েছে।

ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীরের মাঝে বিরোধের মীমাংসা

লাইলাতুম মুবারাকাহ — এর ব্যাখ্যা নিয়ে দুই দল মুফাসসির এর মধ্যে যে মতভেদ দেখা দিয়েছে, তার কারণ ও সমাধান পেশ করার পূর্বে তাফসীর নিয়ে কিছু মৌলিক কথা পেশ করা জরুরী মনে করছি। তা নিম্নরূপঃ

তাফসীরের মাঝে বিরোধ মীমাংসার নীতিমালা

ক) আল্লাহ পাকের মহাগ্রন্থ কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা করার মহা দায়িত্ব যাঁরা পালন করেছেন তাঁরা সকলেই আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই করেছেন এটা সকল মুসলমানের মেনে নিতে হবে। কেননা যাঁরা এ লক্ষ্যে তাফসীর করেননি তাঁদেরকে ‘ মুফাসসির ’ বলার অবকাশ কোথায় ? বরং তাদের তাফসীরকেতো ভ্রান্ত তাফসীর বা “ তাফসির বির রায় ” বলতে হবে। যা উম্মতের জন্য গোমরাহীর কারণ। এখানে লাইলাতুম মুবারাকাহর ব্যাপারে আল্লামা সিরাজীর মতটিকে কিছুক্ষণের জন্য বাদ দিলে যে দু’ ধরনের তাফসীর পরিলক্ষিত হয়, উভয় দলের মুফাসসিরগণ একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই যে তাফসীর পেশ করেছেন এতে কোন হকপন্থী ঈমানদারের দ্বিমত থাকার অবকাশ নেই।

কেননা যেসব মুফাসসির লাইলাতুম মুবারাকাহর ব্যাখ্যা লাইলাতুল কদর দিয়ে করেছেন তাফসীরের মূল সূত্র تفسیر القرآن بالقرآن (কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীছের কিছু বিবরণ দ্বারা তাফসীর) ধরেই করেছেন

আবার যারা উক্ত শব্দ দ্বারা লাইলাতুল বারাতাত তথা ১৫ই শাবানের রাতকে সাব্যস্ত করেছেন তা তাফসীরের দ্বিতীয় মূল সূত্র تفسیر القرآن بالا حاديث النبوية (হাদীছের আলোকেই) করেছেন।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহলে দু’ দলের মধ্যে মতভেদ হলো কেন ? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হলো, আল্লাহ ও রসুলের বাণী কুরআন ও হাদীছের মধ্যে বহু জায়গায় শব্দ ও বাক্যের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে তথা একাধিক অর্থের অবকাশ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে নবীজীর সাহাবাগণের মধ্যে এ জাতীয় আয়াত বা হাদীছের তাফসীর ও ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। একই কারণে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যেও মতভেদ দেখা দিয়ে চার মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে। তাই আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে যে দু’ টি মত দেখা দিয়েছে তার কারণও ‘ লাইলাতুম মুবারাকাহ ’ শব্দের মধ্যে অস্পষ্টতা বিদ্যমান থাকায় এবং এর ব্যাখ্যায় হাদীছের বর্ণনাও একাধিক হওয়ায়। তবে একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, এ ধরনের মতভেদ উম্মতের জন্য কখনও অকল্যাণকর নয় এবং হতেও পারে না। বরং সকল মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যে কোন একটি মত

মেনে নেয়াই উম্মতের ঈমানী দায়িত্ব।

(ধরণ, একটি বিষয় নিয়ে দুই মতের সহীহ হাদীস পাওয়া গেছে। প্রথম মতের হাদীসও নবী করীম (সঃ) থেকে পাওয়া গেছে, অর্থাৎ তিনি নিজেই এই মতটি উল্লেখ করেছেন। আবার দ্বিতীয় মতের হাদীসও নবী করীম (সঃ) থেকে পাওয়া গেছে, অর্থাৎ তিনিও নিজেই এই মতটি উল্লেখ করেছেন। এখন এখান থেকে যে কোন একটি মতকে অস্বীকার করা মানে হল, নবী করীম (সঃ) এর মতকে অস্বীকার করা। তাই তাফসীর বিশারদগণ, মুফাসসিরে কেরাম, মুহাদ্দিসগণ, সমস্ত উলামায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত হয়েছেন, কোন বিষয় নিয়ে মতভেদ দেখা দিলে এবং উভয় পক্ষে যদি সঠিক দলীল প্রমাণ থাকে, তাহলে এর কোন একটিকে ভুল বা ভ্রান্ত বলা যাবে না; বরং সকল মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যে কোন একটি মত মেনে নেয়াই উম্মতের ঈমানী দায়িত্ব। )

খ) ইসলামী শরীয়তের মূল ভিত্তি চার টি।

১। কুরআন

২। হাদীছ

৩। ইজমা

৪। ক্রিয়াস

এসব মিলেই শরীয়ত। মুসলমানের জন্য এগুলো আবশ্যিকভাবে পুরোটাই মেনে চলা জরুরী। সুতরাং কোন বিষয়বস্তু (যেমন এখানের আলোচ্য বিষয় শবে বরাত) সরাসরি কুরআনে না পাওয়া গেলেও এ মন্তব্য করা ঠিক হবে না যে, শরীয়তে তার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং তাকে দেখতে হবে কুরআনের সঠিক তাফসীর – যা হাদীছ ও সাহাবাগণের বাণী সম্বলিত – সে বিশাল তাফসীর-ভান্ডারের দিকে। আর এ কথা পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে যে, হাদীছের বর্ণনাকারীগণের কিছু কিছু বর্ণনা অনেক কারণে এক রকম হয় না বিধায় তাফসীরে দ্বিমত থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং সকল মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

গ) মতভেদপূর্ণ তাফসীরের উপর আমল করার নীতি মালার ব্যাপারেও জ্ঞান ধারণা থাকা আবশ্যকীয় যা নিম্নে প্রদত্ত হলো।

মতবিরোধপূর্ণ আয়াত ও হাদীছের মধ্যে সর্বোত্তম পছন্দ হলো, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়ে মতবিরোধ মীমাংসার পথ অবলম্বন করে আমল করা। যাকে উসূলের কিতাবে (تطبيق) তাতবীক বলা হয়।

আর তা সম্ভবপর না হলে যে মতটি দলীলের দিক থেকে মজবুত বা শক্তিশালী তার উপর আমল করা যাকে উসূলের ভাষায় (ترجيح) তারজীহ বলা হয়।

এটাও সম্ভব না হলে অর্থাৎ উভয় মত সমমানসম্পন্ন দলীল দ্বারা প্রমাণিত হলে তখন একটিকে منسوخ বা রহিত অপরটিকে (نسخ) নাসেখ বলে সাব্যস্ত করা। যেটি (نسخ) নাসেখ বলে সাব্যস্ত হবে তারই উপর আমল করতে হয়।

এ কথাগুলো ভালভাবে অনুধাবন করতঃ পরবর্তী পর্বে লাইলাতুম মুবারাকাহের বিরোধ মীমাংসার দিকে সামান্য আলোকপাত করা হবে ইনশাআল্লাহ।

**শেষ কথাঃ**

তাফসীরের নীতিমালাকে অস্বীকার করে নিজে নিজেই মুফাসসির হয়ে গিয়ে কেউ মনগড়া তাফসীর করলে, সেই তাফসীর পরিত্যাজ্য বলে পরিগণিত হবে। ঠিক তেমনি উসূলে হাদীসের নীতিমালাকে অগ্রাহ্য করে নিজে

নিজেই মুহাদ্দিস হয়ে গিয়ে কেউ যদি হাদীস সম্পর্কে মত প্রদান করে, সেই মতও ডাস্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিতে হবে।

আর যারা শবে বরাত সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীস নেই বলে মিথ্যাচার করে, তাদের সামনে শুধু পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতই পেশ করছি-

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত। {সূরা আলে ইমরান-৬১}

পর্ব ০৭

## কুরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাত - ৪

এ মহাগ্রন্থের ২৫ তম পারা ও ৪৪ নং সূরা “ দুখানের ” শুরুতে যে পাঁচটি আয়াত রয়েছে সে আয়াতগুলোই লাইলাতুল বারাত বিষয়ক আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তাই আয়াতগুলো প্রথমে অর্থসহ পেশ করা হচ্ছে।

حم وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

“ হা মীম (এ অক্ষরদুটি হরুফে মুকাত্তিয়াত বা বিকর্তিত বর্ণ যার অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন) শপথ প্রকাশ্য কিতাবের। নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে আমিই প্রেরণকারী। ”

( সূরা দুখানঃ ১-৫ )

আয়াতে উল্লেখিত لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ লাইলাতুল মুবারাকাহ (বরকতময় রাত) শব্দের ব্যাখ্যা বা তাফসীরকে কেন্দ্র করেই “ কুরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাত ” শীর্ষক আলোচনার সূত্রপাত।

## তাফসীরের দুটি নীতিমালাঃ

পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি যেসব মুফাসসির লাইলাতুল মুবারাকাহর ব্যাখ্যা লাইলাতুল রুদর দিয়ে করেছেন, তাফসীরের মূল সূত্র تفسیر القرآن بالقرآن (কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীছের কিছু বিবরণ দ্বারা তাফসীর) ধরেই করেছেন।

আবার যারা উক্ত শব্দ দ্বারা লাইলাতুল বারাত তথা ১৫ই শাবানের রাতকে সাব্যস্ত করেছেন তা তাফসীরের দ্বিতীয় মূল সূত্র تفسیر القرآن بالا حاديث النبوية (হাদীছের আলোকেই) করেছেন।

এখানে এই দুটি নীতিমালা নিয়ে সংক্ষেপে কিছু বলতে চাই।

## কোরআনের আয়াত দ্বারা কোরআনের তাফসীরঃ

তাফসীরের ব্যাপারে উত্তম ও সঠিক নিয়ম এই যে, কোরআনের তাফসীর কোরআন দ্বারাই করা হবো কারণ কোরআন মাজীদে বর্ণনা এক স্থানে সংক্ষিপ্ত হলেও অন্য স্থানে তার বিস্তারিত বর্ণনা ও ব্যাখ্যাও রয়েছে। আবার এরকম অনেক আয়াত রয়েছে যেখানে প্রশ্ন করা হয়েছে, আর অন্য আয়াতে তার উত্তর দেয়া হয়েছে।

যেমনঃ সূরা আত তারিকের শুরুতে আল্লাহ বলেনঃ

" শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর। আপনি কি জানেন, যে রাত্রিতে আসে, সেটা কি ?"

( সূরা আত তারিকঃ ১-২ )

এখানে আল্লাহপাক প্রশ্ন করেছেন এবং তিনি নিজেই তার পরের আয়াতে তার উত্তর জানিয়ে দিয়েছেনঃ

" সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। "

( সূরা আত তারিকঃ ৩ )

এরকম বহু উদাহরণ ও তাফসীর কোরআনের আয়াত দ্বারা করা যায়। অতএব, এরকম ভাবে কোরআন দ্বারা কোরআনের তাফসীর করাই সবচেয়ে উত্তম।

**হাদীস দ্বারা কোরআনের তাফসীরঃ**

অন্যদিকে হাদীস বা সুন্নাহ দ্বারা কোরআনের তাফসীর করাও তাফসীরের অন্যতম প্রধান একটি মূলনীতি যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, কারণ সুন্নাহ বা হাদীস হল কোরআন কারীমেরই ব্যাখ্যা ও তাফসীর। হযরত ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ ইদরীস শাফিঈ (রহঃ) বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ (সঃ) তাঁর সমস্ত নির্দেশ প্রদান করেন কোরআন মাজীদ থেকেই অনুধাবন করার পর।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে হুজুরে পাক (সঃ) কে কোরআনের কোন আয়াতের বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানানো হয়েছে এবং আদেশ দেয়া হয়েছে তা মানুষকে জানানোর জন্য।

যেমনঃ আল্লাহ পাক কোরআনে ইরশাদ করেনঃ

" আমি এই কোরআন কারীম তোমার উপর এজন্যেই অবতীর্ণ করেছি যে, তুমি তা মানুষের নিকট খোলাখুলিভাবে পৌঁছিয়ে দিবে, যেন তারা চিন্তা গবেষণা করতে পারে। "

( সূরা নাহলঃ ৪৪ )

অতএব, নবী (সঃ) এর কথা দিয়ে কোরআনের আয়াতের তাফসীর করাও যাবে।

যেমনঃ সূরা ইউনুসের ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনঃ

" যারা সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে কল্যাণ এবং তারও চেয়ে বেশী। "

এখন এই আয়াতের 'তারও চেয়ে বেশী' বলতে কি বুঝায় সেটা আমরা পাব হাদীস থেকে যেখানে হুজুরে পাক (সঃ) 'তারও চেয়ে বেশী' এর ব্যাখ্যা করেছেন যে, এটি বলতে আল্লাহর দীদার লাভ করা।

( দেখুনঃ সহীহ মুসলিমঃ হাদীস নং - ৩৪৭ )

এরকম অনেক আয়াতেরই ব্যাখ্যা আমরা রসূলের (সঃ) পবিত্র হাদীস থেকে পাই।

তাছাড়া কুরআনে কারীমের কোন আয়াতের হুকুম রহিত হয়ে গেছে কোন আয়াতের হুকুম বহাল আছে, কোন আয়াত কোন প্রেক্ষিতে নাজিল হয়েছে, কোন আয়াত কাদের উদ্দেশ্য করে নাজিল হয়েছে কোন



আয়াতাংশের প্রকৃত অর্থ কি? আরবী ব্যাকরণের কোন নীতিতে পড়েছে এই বাক্যটি? - এসব বিস্তারিত জানতেও আমাদের হাদীস শাস্ত্রের সান্নিধ্যে আসতে হবে।

আবার অনেক সময় আয়াতের কোন শব্দের ব্যবহার এক এক জায়গায় এক এক রকম হতে পারে।

যেমনঃ

এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- اقيموا الصلاة তথা সালাত কায়েম কর। আরেক আয়াতে বলেছেন- اِنَّ اَنْ يُّصَلُّوا عَلٰى النَّبِيِّ তথা নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা এবং ফেরেস্তারা নবীজীর উপর সালাত পড়ে। এই আয়াতের শেষাংশে এসেছে- وَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيمًا- তথা হে মুমিনরা তোমরাও তাঁর উপর সালাত পড় এবং তাঁকে সালাম জানাও। {সূরা আহযাব-৫৬}

এই সকল স্থানে লক্ষ্য করুন- “সালাত” শব্দটির দিকে। তিনটি স্থানে সালাত এসেছে। এই তিন স্থানের সালাত শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। প্রথম অংশে সালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হল “নামায” অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমাদের নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা নামায কায়েম কর। {সূরা বাকারা-৪৩}

আর দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ও তার ফেরেস্তারা নবীজী সাঃ এর উপর সালাত পড়েন মানে হল- আল্লাহ তায়ালা নবীজী সাঃ এর উপর রহমত পাঠান, আর ফেরেস্তারা নবীজী সাঃ এর উপর সালাত পড়েন, মানে হল নবীজী সাঃ এর জন্য মাগফিরাতের দুআ করেন।

আর তৃতীয় আয়াতাংশে “সালাত” দ্বারা উদ্দেশ্য হল উম্মতরা যেন নবীজী সাঃ এর উপর দরুদ পাঠ করেন। (كتاب الكليات - لأبي البقاء الكفومى)

এরকম শব্দের অর্থ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দিলে হাদীস দ্বারা কোরআনের তাফসীর করা হয়। এখন কেউ যদি শুধু কোরআন থেকেই এর তাফসীর করতে যায়, তাহলে দেখা যাবে, সে হয়তো উপরোক্ত আয়াতসমূহের সব জায়গায় সালাতের অর্থ নামাযকে বুঝাবে, না হলে সে নামাযের স্থানে বলবে রহমাতের কথা, রহমতের স্থানে বলবে দরুদের কথা, দরুদের স্থানে বলবে নামাযের কথা। এরকম করলে দ্বীন আর দ্বীন থাকবে না, হবে জগাখিচুরী।

আবার কোরআনের তাফসীরের জন্য পূর্ণাঙ্গ কোরআন সম্পর্কে যেমন গভীর জ্ঞান দরকার, তেমনি হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কেও গভীর জ্ঞান দরকার।

যেমন আল্লাহ তায়ালা ছয়টি বিষয়ের অনুসরণ করলে বান্দা সফলকাম হয়ে যাবে মর্মে সূরায় মু’ মিনুন এ ঘোষণা করেন-

فَذُفِّلِحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَى آخِرِ- وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (11)

১-নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ। ২-যারা তাদের নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত। ৩-যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। ৪-যারা যাকাত সম্পাদনকারী। ৫-যারা নিজ লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করে। ৬-এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। ৭-এবং যারা নিজেদের নামাযের পরিপূর্ণ রক্ষাবেক্ষণ করে। ১০ এরাই হল সেই ওয়ারিশ। ১১-যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে। {সূরা মুমিনুন-১-১১}



এ আয়াতে সমূহে লক্ষ করুন- ছয়টি কাজ করলে আল্লাহ তায়ালা সফলকাম হওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছেন। সেই সাথে জান্নাতী হওয়ার ঘোষণাও দিয়েছেন। অথচ এ ছয় কাজে রোযার কথা নেই। নেই হজ্জের কথাও। তাহলে কি আল্লাহর বলা সফলকাম হওয়ার জন্য রোযা রাখার প্রয়োজন নেই? নেই হজ্জ ফরজ হলে হজ্জ আদায়েরও। এ দু' টি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ছাড়াই কি ব্যক্তি জান্নাতী হয়ে যেতে পারে? কিভাবে?

আবার অনেক সময় আমরা বাহ্যিক ভাবে কোরআনের যে অর্থ বুঝি, প্রকৃতপক্ষে সে অর্থ নাও হতে পারে।

একটি উদাহরণ দেখুনঃ

আব্দুল্লাহ (রঃ) বলেনঃ যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ হলঃ " যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি " (সূরা আল আনাম - ৮২) । এটি রসূলুল্লাহ (সঃ) এর সাহাবাদের উপর খুবই কঠিন (ভারী) মনে হল। তখন তাঁরা বললেন, আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তারা তাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করেনি? রসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ এ আয়াত দ্বারা এর অর্থ বুঝানো হয়নি। তোমরা লুকমানের বাণী যা তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, শিরক করা বড় জুলুম, (সূরা লোকমানঃ ১৩) তা কি শুন নি?

( সহীহ বুখারী, তাফসীর অধ্যায় )

অর্থাৎ প্রচলিত জুলুম অর্থে এ আয়াত নাজিল হয়নি। এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সাহাবারা এত জ্ঞানী ও তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন হয়েও এই আয়াতের মর্ম বুঝতে পারেন নি, তাদেরকে রসূল (সঃ) বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেখানে আমরা কিভাবে হাদীসের সাহায্য ছাড়া কোরআনের সব আয়াত বুঝব?

এরকম অসংখ্য স্থান আছে, যার অর্থ উদ্ধার করা কঠিন। তাই সেখানে আমাদের কোরআনের পাশাপাশি হাদীস শাস্ত্রেরও সাহায্য নেওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয়, কোরআনও আল্লাহর কথা, হাদীসেও রসূলের মাধ্যমে আল্লাহর বাণীই প্রতিফলিত হয়, তাহলে মাঝে মাঝে মতভেদ হয় কেন? বা একই জিনিসের দুই রকম অর্থ কি হতে পারে?

এর জবাব হল, আল্লাহ ও রসূলের বাণী কুরআন ও হাদীসের মধ্যে বহু জায়গায় শব্দ ও বাক্যের মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে কিছু অস্পষ্টতা রয়েছে তথা একাধিক অর্থের অবকাশ রয়েছে। সে ক্ষেত্রে নবীজীর সাহাবাগণের মধ্যে এ জাতীয় আয়াত বা হাদীসের তাফসীর ও ব্যাখ্যা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। আবার একই রকম বাক্য বা অর্থ সাহাবারা অনেক সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে বুঝেছেন, কেউ কেউ এর ব্যাপক অর্থ করেছেন, আবার কেউ কেউ করেন নি। তাই মুফাসসিরে কেবলমাত্র যে সব মতের স্বপক্ষে দলীল পেয়েছেন, তাদের সবগুলো মতকেই তাদের তাফসীরে তারা উল্লেখ করেছেন এবং সকল মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে যে কোন একটি মত মেনে নেয়াই উম্মতের ঈমানী দায়িত্ব বলে মত প্রকাশ করেছেন।

একই বিষয়ের ক্ষেত্রে একাধিক মতও যে গ্রহণযোগ্য তা আমরা হাদীস শরীফ থেকেই জানতে পারি।

বুখারী শরীফের একটি বিখ্যাত হাদীস থেকে আমরা জানি, খণ্ডকের যুদ্ধের সময় রসূল (সঃ) সাহাবাদের এই বলে আদেশ দেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বনী কুরাইযাহ ছাড়া অন্য স্থানে আসরের নামায না পড়ে। পরবর্তীতে সাহাবাদের মাঝে দুই দল হয়ে একদল আসরের ওয়াক্ত হওয়ায় পথের মধ্যে নামায পড়ে নেন আর একদল সময় পার হওয়া স্বত্তেও বনী কুরাইযাতে গিয়ে নামায আদায় করুন যেহেতু হুজুর (সঃ) বলেছেন তোমাদের মধ্যে কেউ যেন বনী কুরাইযাহ ছাড়া অন্য স্থানে আসরের নামায না পড়ে। অতঃপর হুজুরে পাক (সঃ) জানতে পারলে তিনি উভয় দলের সিদ্ধান্তই ঠিক ছিল বলে মত প্রকাশ করেন।

এখানে দেখুন, হুজুরে পাক (সঃ) এর হুকুম ছিল একটি, কিন্তু আমল হয়ে গেল দুটি আর হুজুরে পাক (সঃ) তা স্বত্তেও কোনটিকে ভুল বা ভ্রান্ত বলেন নি।

এরকম বহু বিষয়েই সাহাবা বা তাফসীরকারকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। যে কেউ কোন একটি তাফসীর গ্রন্থ ভাল মত পড়লেই বিস্তারিত জানতে পারবেন এ সম্পর্কে।

(উল্লেখ্য, মুয়ায (রঃ) এর ইয়েমেনে যাওয়ার পূর্বের হুজুরে পাক (সঃ) এর সাথে তার কথোপকথনের সেই হাদীসটি থেকে আমরা এও জানতে পারি, যখন কোন আয়াতের তাফসীর কোরআন ও হাদীসের মধ্যে পাওয়া না যাবে, তখন সাহাবীগণের (রঃ) কথার দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। তাঁরা কোরআনের তাফসীর খুব ভাল জানতেন, কারণ যে ইঙ্গিত ও অবস্থা তখন ছিল তার সম্যক জ্ঞান তাঁদের থাকতে পারে যাঁরা সেই সময়ে সশরীরে বিদ্যমান ছিলেন। তাছাড়া পূর্ণ বিবেক, বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎ আমল তাঁরাই লাভ করেছিলেন। বিশেষ করে তাদের মধ্যে যারা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, চার খলিফা (রঃ) এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রঃ)।

আবার কোন আয়াতের তাফসীর কোরআন, হাদীস এবং সাহাবীবৃন্দের কথার মধ্যে পাওয়া না গেলে ধর্মীয় ইমামগণের অধিকাংশের অভিমত এই যে, এরূপ স্থলে তাবৈঈগণের তাফসীর নেয়া হবে।

**তবে একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, শুধুমাত্র স্বীয় অভিমত দ্বারা তাফসীর করা সম্পূর্ণরূপে হারাম।**

অনেক বড় বড় মুফাসসিরে কেলাম কোরআনের তাফসীরের ক্ষেত্রে সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করতেন, আর আজ আমরা নিজেরাই মুফাসসির হয়ে গিয়ে লাগামহীন ভাবে তাফসীর করে চলেছি। )

(বিস্তারিত জানতে পড়ুন তাফসীর ইবনে কাসীরের শুরুর অংশগুলো)

### তাফসীরের মাঝে বিরোধ মীমাংসা

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, লাইলাতুম মুবারাকার অর্থ নিয়ে মুফাসসিরে কেলামের মাঝে মতবিরোধ আছে। কোরআনের আয়াত দ্বারা তাফসীর করে অধিকাংশ মুফাসসিরে কেলাম এর অর্থ শবে কদর করেছেন। অন্যদিকে শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা তাফসীর করে অনেক মুফাসসিরে কেলাম এর অর্থ শবে বরাত করেছেন। তাই এই বিরোধ নিরসন বা সমন্বয় করার জন্য উলামায়ে কেলাম তাফসীর বিরোধের নীতিমালা (আগের পর্বে নীতিমালাগুলো কি কি তা উল্লেখ করা হয়েছে, কারও না জানা থাকলে দয়া করে দেখে আসুন ) অনুসরণ করে এই বিষয়ে তাদের মতামত এবং সমাধান বের করেছেন এবং পরিশেষে কেউ কেউ এক নীতিমালা অনুসরণ করে শবে কদরের পক্ষে রায় দিয়েছেন আর কেউ কেউ অন্য নীতিমালা অনুসরণ করে শবে বরাতের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তাই এখানে আমরা সংক্ষেপে নীতিমালার আলোকে মুফাসসিরে কেলাম ও উলামায়ে উম্মাতের মন্তব্য তুলে ধরছি।

### মুফতী মীযানুর রহমান সাঈদ

**বিরোধ মীমাংসার প্রথম নীতি تطبیق তাতবীক তথা সামঞ্জস্যসাধনঃ**

উলামায়ে কেলাম বিভিন্ন ভাবে এর মীমাংসা করেছেন। যেমন প্রথম নীতিমালা তথা تطبیق তাতবীক এর আলোকে এ ব্যাপারে কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নে পেশ করা হলোঃ

### প্রথম মীমাংসা

শবে রুদর সম্পর্কে ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) এর প্রসিদ্ধ মত হলো, বছরের যে কোন রাতে শবে রুদর হতে পারে। রাতটি রমজানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ কুরআন ও হাদীছে এ বিষয়টি উহ্য রয়ে গেছে। অতএব, এ মতটিকে কেন্দ্র করে আলোচ্য আয়াতের মতবিরোধের মীমাংসাকল্পে বলা যেতে পারে যে, কুরআন শরীফ শা' বান মাসে ১৫ তারিখের রাত্রিতে অবতীর্ণ হয়েছে বলে ধরা হবে। এবং সে বছর একই রাতে শবে বরাত এবং শবে রুদরের সংমিশ্রণ ঘটেছে বলে বলা যেতে পারে। তাই এ রাতটা শবে রুদর হওয়ার সাথে সাথে শবে বরাতও বটে, হেতু উভয়ের মর্যাদার সম্মিলনে রাতটি সম্মানিত হলো। এভাবে রাতটিতে কুরআন শরীফ নাযিল হওয়ায় শবে বরাত ও শবে রুদর উভয় রাতেই অবতীর্ণ হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। এতে উভয় মতের মীমাংসাও হয়ে যাবে। অন্য কোন বিরোধ থাকবে না। সুতরাং لَيْلَةُ الْمُبَارَكَةِ লাইলাতুম মুবারাকাহ এর অর্থ শবে রুদর দ্বারা করা যেমন সঠিক তেমনি শবে বরাত দিয়ে করাও সঠিক হয়েছে। কোন বিরোধ থাকছে না।

## দ্বিতীয় মীমাংসা

১।

এভাবেও মীমাংসা হতে পারে যে, সূরা দুখানে যে বলা হয়েছে, বরকতময় রাতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে কুরআন অবতীর্ণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে মাত্রা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা শবে বরাতের পবিত্র রাতে কুরআন অবতীর্ণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আর এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক সে বছরের মাহে রমজানের শবে রুদরেই কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যার বর্ণনা সূরা রুদরে দেয়া হয়েছে এবং রাতটি রমজান মাসে অবস্থিত সুতরাং কোন আয়াত ও মতামতের মধ্যে বিরোধ রইল না। কেননাঃ সূরায়ে দুখানে

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ

মুবারক রাতে কুরআন নাযিল করার অর্থ হচ্ছে নাযিল করার সিদ্ধান্ত। আর সূরায়ে রুদর এবং

الْقُرْآنُ فِيهِ أَنْزَلَ الَّذِي رَمَضَانَ شَهْرَ

এর মধ্যে কোরআন নাযিল হওয়ার অর্থ হচ্ছে, শবে বরাতের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাস্তবে তা নাযিল হওয়া।

২।

হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) এক বয়ানে বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

“ কুরআনের অবতরণ দুই বার হয়েছে। এটা এভাবে হয়েছে যে, এক রাত্রে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে, দ্বিতীয় রাতে সে সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন হয়েছে অর্থাৎ শবে বরাতের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে, এবার রমযানে যে শবে রুদর আসবে সে রাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হবে অতঃপর রমযানে শবে রুদরে তা অবতরণ করা হয়েছে। আর এ কথার অধিক প্রচলন রয়েছে যে, কোন কর্ম সংঘটিত হওয়ার নিকটতম হলে তা সংঘটিত হয়েছে বলে ধর্তব্য হয়। সুতরাং সূরায়ে রুদরে কুরআন অবতরণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে বাস্তবে অবতীর্ণ হওয়া। যা শবে রুদরে অবস্থিত। আর সূরায়ে দুখানে মোবারক রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে অবতীর্ণ হওয়ার সময় অতি সন্নিহিত। এটাকেই অবতীর্ণ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এটি হলো শবে বারাতের। উভয়টি রাত যেহেতু পরস্পর অতি নিকটবর্তী তাই অবতরণের নিকটতম সময়কেও অবতরণের অর্থেই ধরে নেয়া হয়েছে। ”

( দেখুন ওয়াজ ও তাবলীগঃ পৃ - ৮ )

( উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ইংরেজী গ্রামার আমরা যারা জানি, তারা অনেকেই এটি জানি যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিকট ভবিষ্যতের কোন কাজকে present tense দ্বারা প্রকাশ করা হয়, future tense ব্যবহার করা হয় না। আর এ দিন পুরোপুরি নাযিল না হয়ে নাযিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এর পক্ষের আরেকটি যুক্তি হল এর পরের আয়াত যেখানে উল্লেখ আছে এ রাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় অর্থাৎ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ বিষয়ে পরবর্তী পর্বে আরও আলোচনা আসছে )

৩।

এর সারমর্ম হলোঃ

হযরত থানবী (রহঃ) এর উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, উভয় মতের বিরোধের সমাধানকল্পে এভাবে বলা উচিত যে, সুরায়ে দুখানে মুবারক রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে শবে বারাতে অবতীর্ণ হওয়ার সিদ্ধান্ত। আর সুরায়ে রুদরে লাইলাতুল রুদরে অবতীর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন। উভয়টির মধ্যকার সময় স্বল্প তাই সিদ্ধান্তকেই অবতীর্ণ বলে ধরে নেয়া হয়েছে। সুতরাং উভয় মতামতের মাঝে কোন বিরোধ বিদ্যমান থাকলো না। তাই সূরা দুখানের *ليلة مباركة* থেকে যে সব তাফসীরকারক *ليلة النصف من شعبان* তথা মধ্য শাবানের রাত তথা শবেবরাত উদ্দেশ্য স্থির করেছেন— এটি একটি গ্রহণযোগ্য মতামত; এটাকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই।

৪।

হযরত থানবী (রহঃ) এর উক্ত মতটি থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে একই সুরার আয়াত

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

এর তাফসীর দ্বারা হযরত (রহঃ) তার স্বীয় গ্রন্থ ( *تفسير بيان القرآن* ) বায়ানুল কুরআনে বলেন যে, “ প্রতিটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের ফয়সালাও এ মোবারক রাতে হয়ে থাকে ” – এর ব্যাখ্যা হলো তাঁর ভাষায়ঃ

“ শেষ পর্যন্ত এ কথা বলতে হবে যে, শবেবরাত ও শবে রুদর উভয় রাতে প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়। এটা অসম্ভবের কিছুই নয়। বরং তা এভাবে হয় যে বিভিন্ন ঘটনা, বিষয়াবলী লিখিতভাবে সিদ্ধান্ত হয় শবে বরাতে এবং তা সংশ্লিষ্টদের নিকট হস্তান্তর হয়ে থাকে শবে রুদরে। যেমন রুহুল মাআনীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রঃ) থেকে সূত্রবিহীনভাবে হুবহু এভাবে বর্ণিত হয়েছে। (উল্লেখ্য) যে, এটা একটা সম্ভাবনাময় তাফসীর (একমাত্র সঠিক তাফসীর নয়) তাই এর জন্য অকাট্য সূত্র দ্বারা প্রমাণিত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। ”

( দেখুন বায়ানুল কুরআনঃ খ – ১, পৃ – ৮৬ )

৫।

উল্লেখ্য এখানে ইবনে আব্বাসের যে বর্ণনার দিকে হযরত (রহঃ) ইঙ্গিত করেছেন তা তাফসীরে মাযহারীতে এভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে।

“ আল্লাহ তাআলা সকল প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন শবে বরাতে এবং তা সংশ্লিষ্টদের নিকট সোপর্দ করেন রুদরের রাতে। ”

( দেখুন তাফসীরে মাযহারীঃ খ – ৮, পৃ – ৩৬৮ )

## তৃতীয় মীমাংসা

১।

কেউ কেউ এভাবে মতদ্বয়ের সমাধান করেছেন যে, শবে বরাতে কুরআন শরীফ লওহে মাহফুজ থেকে প্রথম আকাশে অবতীর্ণ হয়েছে। এর বর্ণনা সূরা দুখানে দেয়া হয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে তা রুদরের রাতে রসূল (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয়ে ২৩ বছরে তার সমাপ্তি ঘটেছে যার বর্ণনা সূরা রুদরে বিদ্যমান আছে এবং সে রুদরের রাতটি রমজান মাসে অবস্থিত সুতরাং কুরআন মাহে রমজানের শবে রুদরে রসূল (সঃ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে দুনিয়ার আসমান হতে আর শবে বরাতে অবতীর্ণ হয়েছে লওহে মাহফুয থেকে। এ অর্থেই সূরা দুখানে মোবারক রাতে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

২।

এ মীমাংসার পক্ষে বিবরণ পাওয়া যায় আল্লামা আবুস সাউদ এর সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ تفسیر ابی السعود তাফসীরে আবি সাউদ এর মধ্যে। তিনি বলেনঃ

“ মোবারক রাত থেকে উদ্দেশ্য হলো, শবে রুদর। কেউ কেউ বলেছেনঃ এর উদ্দেশ্য হল, শবে বরাত। এ রাতে কুরআনের অবতরণ আরম্ভ হয় অর্থাৎ এ রাত্রে পরিপূর্ণ কুরআন দুনিয়ার আসমানে লৌহে মাহফুজ থেকে একসঙ্গে অবতীর্ণ হয় এবং হযরত জিবরাইল (আঃ) তা তাখতির মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন।

“ প্রতিটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের ফায়সালা হয় ” (এ ব্যাপারে বলেন) কেউ কেউ বলেছেনঃ

শবেবরাতে লওহে মাহফুজ থেকে লিখিতভাবে অবতরণ আরম্ভ হয় এবং শবে রুদরে গিয়ে তার সমাপ্তি ঘটে। রিযিকের বিষয়ে লিখিত তাখতী মিকান্নিল (আঃ) কে দেয়া হয়। যুদ্ধ-বিবাদ বিষয়-সম্বলিত তাখতী জিবরাইল (আঃ) কে অনুরূপ ভূমিকম্প, বিজলীর গর্জন, ভূমি ধসে পড়ার বিষয়গুলোও তাকে দেয়া হয় এবং সকল আমলের বিষয় দুনিয়ার আসমানের বিশিষ্ট ফেরেশতা ইসমাইলকে প্রদান করা হয়। বিপদ ও মুসিবতের বিষয়গুলো আযরাইল (আঃ) কে প্রদান করা হয়। ”

( দেখুন তাফসীরে আবি সাউদঃ খ – ৬, পৃ – ৪৭ )

৩।

উক্ত মতের স্বপক্ষে তাফসীরে জালালাইনে বিবরণ পাওয়া যায় এভাবেঃ

“ মোবারক রাত অর্থ হচ্ছে, শবে রুদর অথবা মধ্য-শাবানের রাত যে রাতে কুরআন শরীফ সপ্তম আসমান থেকে দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হয়। ”

( দেখুন জালালাইন শরীফঃ পৃ – ৪০৮ )

৪।

ইমাম ফখরুদ্দিন রাজী (রহঃ) এ ব্যাপারে সবিস্তারে আলোচনা করার পর মাসআলার শেষে বলেছেনঃ

“ বলা হয়েছে যে, শবে বরাতে লওহে মাহফুয হতে কুরআন অবতরণের কাজ শুরু হয় এবং শবে রুদরে এসে

তার সমাপ্তি ঘটে। ”

( দেখুন তাফসীরে কবীরঃ খ – ১৪, পৃ – ৩৪১ )

### শেষ কথাঃ

এভাবে তাফসীর বিরোধের প্রথম নীতিমালার আলোকে লাইলাতুম মুবারাকার ব্যাখ্যায় অনেক মুফাসসিরে কেলাম ও উলামায়ে উম্মাত শবে বরাতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর তাদের এই ব্যাখ্যার পক্ষে সবচেয়ে বড় যুক্তি হল " এ রাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় " আর শবে বরাত ও জ্ঞানপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অনেক হাদীস পাওয়া যায়। আবার অন্যদিকে অন্যান্য নীতিমালার আলোকে অনেক মুফাসসিরে কেলাম লাইলাতুম মুবারাকার অর্থ শবে ক্বদরকে দিয়ে করেছেন যার আলোচনা পরবর্তী পর্বসমূহে আলোচিত হবে ইনশাআল্লাহ।

আজ কোরআনে কারীমের একটি আয়াত পেশ করে শেষ করবঃ

وَلَوْ رُدُّوهٗ إِلَى الرَّسُولِ وَآلِىٓ الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

এবং যদি এ ক্ষেত্রে তারা রসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও আদেশদানকারী যোগ্য ব্যক্তিদের প্রতি রুজু করতো তাহলে নিশ্চয় তাদের মাঝে যারা সমস্যার সমাধান বের করার যোগ্যতা রাখেন তাঁরা এর গুচতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারতেন।

পর্ব ০৮

### কুরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাত - ৫

এ মহাগ্রন্থের ২৫ তম পারা ও ৪৪ নং সূরা “ দুখানের ” শুরুতে যে পাঁচটি আয়াত রয়েছে সে আয়াতগুলোই লাইলাতুল বারাত বিষয়ক আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। তাই আয়াতগুলো প্রথমে অর্থসহ পেশ করা হচ্ছে।

حَمَّ وَالْكُنَّابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْراً مِّنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

“ হা মীম (এ অক্ষরদুটি হরুফে মুকাত্তিয়াত বা বিকর্তিত বর্ণ যার অর্থ আল্লাহই ভাল জানেন) শপথ প্রকাশ্য কিতাবের। নিশ্চয় আমি কুরআন নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে। নিশ্চয় আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক জ্ঞানপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। আমার পক্ষ থেকে আদেশক্রমে আমিই প্রেরণকারী। ”

( সূরা দুখানঃ ১-৫ )

আয়াতে উল্লেখিত ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ (বরকতময় রাত) শব্দের ব্যাখ্যা বা তাফসীরকে কেন্দ্র করেই “ কুরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাত ” শীর্ষক আলোচনার সূত্রপাত।

গত পর্বে আমরা তাফসীর বিরোধ মীমাংসার প্রথম নীতি تطبیق তাতবীক তথা সামঞ্জস্যসাধন আলোকপাত করেছিলাম এবং এই নীতিমালার আলোকে মুফাসসিরে কেলাম ও উলামায়ে উম্মাতের মতামত উল্লেখ করেছিলাম। এই নীতিমালার আলোকে অধিকাংশ উলামায়ে কেলামই লাইলাতুম মুবারাকার তাফসীরে শবে বরাতকে সম্ভাব্য গ্রহণযোগ্য মত বলে রায় দিয়েছেন।

এই পর্বে আমরা তাফসীর বিরোধ মীমাংসার দ্বিতীয় নীতিমালা ( ترجیح ) তারজীহ তথা প্রাধান্যদান সম্পর্কে



সংক্ষেপে আলোচনা করব এবং এই নীতিমালার আলোকে মুফাসসিরে কেরাম ও আলেম উলামার মতামত উল্লেখ করব।

## দ্বিতীয় নীতিমালা ( ترجيح ) তারজীহ তথা প্রাধান্যদান

লাইলাতুম মুবারাকাহর উভয় ব্যাখ্যার সমাধান কল্পে দ্বিতীয় নীতিমালা তারজীহ ترجيح অর্থাৎ অগ্রাধিকার ভিত্তিতেও দেয়া হয়েছেঃ

এ পদ্ধতিতেও একাধিক ব্যাখ্যা রয়েছে, নিম্নে তা পেশ করা হলোঃ

### প্রথম মতামত

১।

কারো কারো মতে সূরা দুখানের আয়াতে লাইলাতুম মুবারাকাহর ব্যাখ্যা দ্বয়ের মধ্যে শবেবরাত এর ব্যাখ্যাটাই প্রাধান্যতা পায় এবং এটাই নির্ভরযোগ্য মত কারণ এখানে(লাইলাতুম মুবারাকাহ) বরকতময় রাতটির দু' টি বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। একটি হলো, পবিত্র কুরআনের অবতরণ ( انا انزلناه ) অপরটি হলো জ্ঞানপূর্ণ বিষয়সমূহের নির্ধারণ বা পৃথক করণ। কুরআন অবতরণ বলতে যদি অবতরণের সিদ্ধান্ত ধরে নেয়া হয় তাহলে এ বৈশিষ্ট্যটি শবে বরাতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। কিন্তু দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি একমাত্র শবে বরাতের জন্য প্রযোজ্য। শবে রুদরের ব্যাপারে তা প্রযোজ্য নয়। কারণ অধিকাংশ হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, শবেবরাত ভাগ্য নির্ণয়ের রাত। যা বহু তাফসীর গ্রন্থে হযরত ইকরামাহ এর তাফসীরে দলীল স্বরূপ পেশ করা হয়েছে। এবং বহু হাদীছ এ ব্যাপারে সামনে পেশ করা হবে। কিন্তু শবে রুদর সম্পর্কে ভাগ্য-নির্ণয়ের এবং জ্ঞানপূর্ণ বিষয়ের নির্ধারণ সম্বলিত তেমন কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। অতএব উভয় বৈশিষ্ট্যের দিকটাকে বিবেচনায় আনলে এখানে لمباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ এর ব্যাখ্যা শবে বরাত হওয়াই উত্তম সমাধান কেননা, এর ব্যাখ্যায় শবে রুদর মেনে নিলে শবে বরাতে ভাগ্য নির্ণয় সম্বলিত অনেক হাদীছকে বাদ দিতে হয়।

২।

এ কারণেই হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহঃ) “ যাওয়ালুস সিনাহ ” এবং “ দাওয়াতে উবুদয়্যিত ” পুস্তিকাধ্বয়ে উক্ত মতটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং বলেছেন যে লাইলাতুম মুবারাকাহ থেকে শবে বরাত উদ্দেশ্য।

অনুরূপ শেখ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহঃ) তার স্বীয় গ্রন্থ “ মা ছাবাতা বিসসুন্নাহ ” এবং “ মাজালিসুল আবরার ” গ্রন্থদ্বয়ে সূরা দুখানের আয়াতসমূহ থেকে শবে বরাত উদ্দেশ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন।

( দেখুন মাজালিসুল আবরারঃ পৃ – ১৭৭ )

৩।

আল্লামা আব্দুলহক মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহঃ) ما ثبت بالسنة এর বিবরণটি নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

“ অধিকাংশ উলামাদের মতামত হলো, কুরআন অবতরণ ও প্রতিটি প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের ফয়সালা শবে রুদরে সম্পন্ন হলেও এসব বিষয় আরম্ভ হয়েছে শবে বারাততথা মধ্য শাবানের রাতো ”

( দেখুন হাকীকতে শবে বরাতঃ পৃ – ৮ )

৪।

এ মর্মে হযরত থানভী (রহঃ) এর ওয়াজ ও তাবলীগের উপরোক্ত বিবরণটিও আরকেবার উল্লেখযোগ্যঃ

কুরআনের অবতরণ দুই বার হয়েছে। এক রাতে অবতরণের হুকুম (সিদ্ধান্ত) হয়েছে দ্বিতীয় রাতে তার বাস্তবায়ন হয়েছে ... ।

মোদাকথা হলো সূরায়ে রুদরে কুরআন অবতরণের অর্থ হলো, অবতরণের বাস্তবায়ন আর সূরায়ে দুখানের অর্থ হলো কুরআন অবতরণের সিদ্ধান্ত যা শবে বরাতে হয়েছে

এসব উদ্ধৃতি দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত মুহাদ্দিসে দেহলভী ও হযরত থানভী (রহঃ) প্রমুখের ন্যায় মুহাক্কিক ফকীহে উম্মত সূরা দুখানের আয়াতের তাফসীরে শবে বরাতের ব্যাখ্যাকে মত ব্যক্ত করেছেন অর্থাৎ শবেবরাতকে **ترجيح** তারজীহ দিয়েছেন।

৫।

উপরন্তু মাওঃ ইসলামুল হক মুযাহেরী সাহেব তার “ হাকীকতে শবে বরাত ” কিতাবের অষ্টম পৃষ্ঠায় শায়খুল আদব হযরত আল্লামা এযায় আলী (রহঃ) এর একটি বক্তব্য তুলে ধরে বলেছেন যে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত শায়খুল আদব (রহঃ) এর মতও শবেবরাতের বিষয়টি প্রাধান্য পাচ্ছে

কারণ হযরত শায়খুল আদব (রহঃ) এক বয়ানে বলেছেনঃ

কিছু আকাবিরীনে উম্মতের কথা হলো, শবে বরাতের মধ্যে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ ফজীলতের বিষয় রয়েছে। এর মধ্যে একটি হলো জ্ঞানপূর্ণ বৃহৎ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এরাতেই গ্রহণ করা হয়। কুরআনে পাকে বলা হয়েছে “ এ রাতে প্রজ্ঞাসম্পন্ন বিষয়ের চূড়ান্ত করা হয় ” (এর পর বলেন) হযরত শাইখ দেহলভী (রহঃ) “ মাছাবাতা বিসসুন্নাহ ” কিতাবে এ ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট বাক্য উচ্চারণ করেছেন। (এর পর তিনি শায়খ দেহলভীর উল্লেখিত বিবরণটি তুলে ধরেন। ) অতঃপর মাওঃ ইসলামুল হক বলেনঃ

এতে বুঝা যায়, হযরত শায়খুল আদব (রহঃ) এর মতামতও শবে বরাতের দিকে ( কেননা, হযরত (রহঃ) **فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ** আয়াতের অর্থ শবে বরাত দিয়েই করেছেন এবং বলেছেন এ রাতে বৃহৎ কাজগুলোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে থাকে। )

তারজীহের দ্বিতীয় মতামত

১।

পক্ষান্তরে সূরা দুখানের শব্দ **ليلة مباركة** লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীর অধিকাংশ মুফাসসির ও মুহাদ্দিহ শবেবরাত দিয়ে করেছেন।

কুরআনের সূরায়ে রুদরের মর্ম এবং

القرآن فيه انزل الذي رمضان شهر

আয়াতের পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাখ্যাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পেশ করেছেন। কেননা, এ আয়াতে বলা হয়েছে,

কুরআন রমজান মাসেই অবতীর্ণ করা হয়েছে। আবার সূরা কদরে আল্লাহ পাক বলেনঃ আমি নিঃসন্দেহে কুরআনকে শবে কদরে নাযিল করেছি। এ দু' আয়াতকে মিলালে অর্থ দাঁড়ায়, শবে কদর নামক রাতটি রমজানে অবস্থিত। এদিকে সূরা দুখানে বলা হয়েছে, আমি কুরআনকে এক বরকত পূর্ণ রাতে নাযিল করেছি। তাহলে এ বরকতপূর্ণ রাতটি ঐ শবে কদরই হবে যা রমজানে অবস্থিত। সুতরাং কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও সূরার মর্মের দিকে তাকালে লাইলাতুম মুবারাকাহ থেকে যে শবে কদর উদ্দেশ্য এটা অতি পরিষ্কার।

তাই উপরোল্লিখিত ৮টি তাফসীর গ্রন্থের প্রায় সবক'টি তাফসীরেই এ মতটিকে প্রাধান্য ও সর্বাধিক সঠিক বলে মত পেশ করা হয়েছে। এ মতের পক্ষে রয়েছেন অধিকাংশ মুফাসসির ও মুহাদ্দিস যেমন ইমাম নববী, ইমাম ইবনে কাছীর, ইমাম কুরতুবী, আল্লামা মোহাম্মদ আল আমীন শিনকীতী এবং মুফতিয়ে আযম আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ) সহ অনেকে।

এ মতামতের প্রাধান্য প্রমাণে উদাহরণস্বরূপ কিছু তাফসীর গ্রন্থের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

২।

ইমাম কুরতুবী (রহঃ) উভয় মতকে সবিস্তারে বর্ণনাকরার পর বলেনঃ

“ মোবারক রাত বলতে শবে কদর উদ্দেশ্য। ইকরামা (রহঃ) বলেছেন, মধ্য শাবানের রাত উদ্দেশ্য। তবে প্রথম ব্যাখ্যাটি অধিক বিশ্বাস্য। কেননা, কুরআন শরীফ শবে কদরে অবতীর্ণ হওয়ার কথা পরিষ্কারভাবে কোরআনে বিদ্যমান। ”

( কুরতুবীঃ খ – ১৬, পৃ – ৮৫ )

৩।

ইমাম ইবনে কাছীর (রহঃ) বলেনঃ

“ যারা বলে যে, বরকতময় রাত বলতে মধ্য-শাবানের রাতকে বুঝানো হয়েছে ; যেমন বর্ণিত হয়েছে হযরত ইকরামা (রহঃ) থেকে, তারা প্রকৃত সত্য থেকে দূরে অবস্থান করে, কারণ, রাতটি যে রমযানে অবস্থিত তা কুরআন সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছে। ”

( তাফসীরে ইবনে কাছীরঃ খ – ৪, পৃ – ২৪৫ )

৪।

আল্লামা আলুসী (রহঃ) রুহুল মাআনীতে বলেনঃ

“ বরকতময় রাত থেকে শবে কদর বুঝানো হয়েছে। যেমন এটি বর্ণিত আছে ইবনে আব্বাস (রঃ) কাতাদাহ, ইবনে জুবাইর, মুজাহিদ, ইবনে যাইদ এবং হাসান (রহঃ) থেকে। এটি অধিকাংশ মুফাসসিরের ব্যাখ্যা। বাহ্যিক প্রমাণাদি এদেরই স্বপক্ষে। ”

( রুহুল মাআনীঃ খ – ৯, পৃ – ১১০ )

৫।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রহঃ) বলেনঃ

“ বরকতময় রাত থেকে যারা মধ্য-শাবানের রাত বুঝেছেন , আমি তাদের নিকট কোন নির্ভরযোগ্য দলীল দেখি না। যদি এ ব্যাপারে রসূল (সঃ) থেকে সঠিকভাবে কিছু প্রমাণ পাওয়া যেত তবে এর চেয়ে উত্তম কথা আর কিছু নেই নতুবা বলতে হবে প্রথম মতটি (শবে রুদর) অধিক সত্য ও হক। ”

( তাফসীরে কবীরঃ খ – ১৪, পৃ – ২৩৯ )

৬।

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (রহঃ) বলেনঃ

“ বরকতময় রাতটি শবে রুদর অন্যরা বলেছেনঃ বরং সেটি মধ্য শাবানের রাত। এর মধ্যে যারা বলেছেন, এর দ্বারা শবে রুদর বুঝানো হয়েছে – সেটি সঠিক কথা। ”

( দেখুন তাফসীরে তাবারীঃ খ – ১১, পৃ – ২২১ )

একটি পর্যালোচনা

১।

এ সকল বিবরণের দ্বারা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ দ্বারা শবে রুদর হওয়াটাই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত। এ অধমের ধারণা মতেও অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতামতই সঠিক ও অধিক নির্ভরযোগ্য। কেননা এটা তাফসীরের প্রধান মূলনীতি অর্থাৎ কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারাই করা হয়েছে। আর ইকরামাহ ও কাতাদাহ প্রমুখের ব্যাখ্যাটি হাদীছের আলোকে এবং তাবেরীনের বিবরণের মাধ্যমে করা হয়েছে যা তাফসীরের দ্বিতীয় মূলনীতি সুতরাং অধিক নির্ভরযোগ্য তাফসীর হলো সূরা দুখানের শব্দ ليلة مباركة লাইলাতুম মুবারাকাহ থেকে উদ্দেশ্য শবে রুদর হওয়া। যদিও শবে বরাত হওয়ারও সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করা যায় না।

২।

উল্লেখ্য, আমি আগেই বলেছি শরীয়তের মূল ভিত্তি চারটি। তাই কোন বিষয়বস্তু কুরআন দ্বারা প্রমাণিত না হলে তার অর্থ এই নয় যে, বিষয়টি ভিত্তিহীন বরং দেখতে হবে শরীয়তের দ্বিতীয় মূল উৎস হাদীছে তা আছে কি না? ইনশাল্লাহ সামনে বহু সহীহ ও আমলযোগ্য হাদীস দ্বারা শবেবরাত যে প্রমাণিত তা অতি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা হবে। তাই শবে বরাতের আলোচনা সরাসরি কুরআনে নেই বলে তা অস্বীকার করা ও ভিত্তিহীন বলা যেমন অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতা তেমনিভাবে শবে বরাতের বিবরণ কুরআনে সুস্পষ্ট আছে মনে করাও এর নামাস্তুর এ বাস্তবতার কারণেই দেখা যায় যেসব সাহাবী লাইলাতুম মুবারাকাহ এর তাফসীর শবে রুদর দ্বারা করেছেন সে সব সাহাবী থেকেই আবার শবে বরাতের ফযীলত সম্বলিত হাদীছ পাওয়া যায় এর অর্থ হল যাঁরা লাইলাতুম মুবারাকাহ থেকে শবে রুদর বুঝেছেন তাদের কেউ শবে বরাতকেও অগ্রাহ্য ও ভিত্তিহীন মনে করেন নি। বরং তার গুরুত্ব ও ফযীলতকে তারা স্বীকার করে নিয়েছেন এবং এ রাতে ইবাদাত বন্দেগী করে তার অপরিসীম ফজীলত অর্জন করেছেন।

৩।

উক্ত দীর্ঘ আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, সূরা দুখানের শব্দ লাইলাতুম মুবারাকাহর

ব্যখ্যা শবে রুদর দ্বারা করার কারণে একথা কখনও সাব্যস্ত হয় না যে শবে বরাত নামক পবিত্র কোন রাত শরীয়তে নেই। এমন কেউ বুঝে থাকলে বা এ ধরনের উক্তি কেউ করে থাকলে নির্দিধায় বলতে হবে এরা কুরআন, সুন্নাহ, শরীয়ত কিছুই বুঝে নাই অথবা সব বুঝেও তা অস্বীকার করে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের পক্ষপাতিত্ব করছে

চমৎকার সমাধানঃ

১।

সূরা দুখানের লাইলাতুম মুবারাকাহ এর নির্ভরযোগ্য তাফসীর যদি শবে রুদর হয় তাহলে فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ অর্থাৎ এই রাতেই মানুষের ভাগ্য-তালিকা বন্টন করা হয়-এর তাফসীর হবে কেননা, ভাগ্য তালিকা বন্টনের রাতকে রসূল (সঃ) এর হাদীছে শবে বরাত বলা হয়েছে সুতরাং এ বাহ্যিক বিরোধের সমাধান কী হবে?

এতক্ষণের দীর্ঘ আলোচনায় আশা করি এর উত্তর সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

২।

পরিশেষে এ প্রসঙ্গে শারেহুল হাদীছ আল্লামা মুল্লা আলী আল ক্বারী (রহঃ)এর বক্তব্যটি এখানে তুলে ধরা হল, উক্ত প্রশ্নের সমাধান বক্তব্যটির মাধ্যমে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেনঃ

“ এ বিষয়ে তো কোন বিতর্ক নেই যে, শা’ বানের পঞ্চদশ রজনীতে প্রজ্ঞাময় বিষয়াবলীর ফয়সালা হয়, যেমন আয়েশা (রঃ) এর হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। হ্যাঁ, এতে সংশয় রয়েছে আয়াতে কারীমা

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

দ্বারা শবে বরাত উদ্দেশ্য কি না? সঠিক কথা এটাই যে, এই আয়াত দ্বারা শবে বরাত উদ্দেশ্য নয়। তখন আয়াতে কারীমা এবং হাদীছ দ্বারা এ কথাই বুঝা যায় যে এ প্রজ্ঞাময় কাজ উভয় রাতেই আঞ্জাম দেয়া হয়ে থাকে উভয় রাতের অতিরিক্ত মাহাত্ম্য বর্ণনা করার জন্য। এটাও সম্ভাবনা আছে যে, শা’ বানের পঞ্চদশ রজনীতে প্রজ্ঞাময় কাজগুলি আঞ্জাম দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে যা আগামী শবে রুদর পর্যন্ত পূর্ণ হতে থাকে তাছাড়াও এই সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই কাজগুলোর ব্যবস্থাপনা এই রজনীতে সংক্ষিপ্ত আকারে দ্বিতীয় রজনীতে বিস্তারিতভাবে হয়ে থাকে। এটাও হতে পারে যে, রাত্রিদ্বয় হতে একটিকে পার্থিব কাজগুলির সমাধানের জন্য নির্ধারণ এবং অন্যটিকে আখেরাতের কাজসমূহের জন্য নির্দিষ্ট করা হয় ”

( মিরকাত শরহে মিশকাতঃ ৩/১৯৫ )

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে কুরআন সুন্নাহ ও শরীয়তকে বুঝা ও তার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

শেষ কথাঃ

কোরআনের দৃষ্টিতে লাইলাতুল বারাতাত শীর্ষক আলোচনা গুলো ভালভাবে অনুধাবন করলে আমরা বুঝতে পারি যে, লাইলাতুম মুবারাকার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত হল শবে রুদর, যার পক্ষে অধিকাংশ মুফাসসিরে কেরামই রায় দিয়েছেন। আবার একদল মুফাসসিরে কেরাম এর অর্থ করেছেন শবে বরাত, যে মতটিকে ভ্রান্ত বলারও অবকাশ নেই, তাই তো যেসব মুফাসসিরে কেরাম শবে রুদরকে অধিকতর সঠিক বলেছেন, তারাই

আবার দ্বিতীয় সম্ভাব্যমত হিসেবে শবে বরাতকেও উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী পর্ব থেকে হাদীসের আলোকে শবে বরাত শীর্ষক আলোচনা শুরু করব এবং ইনশাআল্লাহ প্রমাণ করব যে, সহীহ হাদীস দ্বারাই শবে বরাতের ফযীলত প্রমাণিত।

আজ কোরআনে কারীমের কিছু আয়াত পেশ করে শেষ করব।

আল্লাহ পাক বলেন,

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘ হে মুমিনগণ, তোমরা সকলে আল্লাহর নিকট তওবা কর। তাহলে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।’ [সূরা নূর : ৩১]

وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ

“আমি অবশ্যই ক্ষমাশীল তার প্রতি, যে তওবা করে- বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎ কাজ করে ও সৎ পথে অবিচল থাকে।” [সূরা তাহা : ৮২]

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

“আল্লাহ অবশ্যই সে সকল লোকের তওবা কবুল করবেন যারা ভুলভ্রান্ত: মন্দ কাজ করে এবং সত্ত্বর তওবা করে। এরাই তারা যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। [নিসা : ১৭]”

فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“সীমালঙ্ঘন করার পর কেউ তওবা করলে ও নিজেকে সংশোধন করলে আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাপ্রবণ হবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” [মায়িদা : ৩৯]

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّنْ تَقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

“বিশ্বাস করার পর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাদের তওবা কখনো কবুল করা হবে না। এরাই পথভ্রষ্ট।” [ইমরান : ৯০]

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرْ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا

“যারা বিশ্বাস করে ও পরে সত্য প্রত্যাখ্যান করে, আবার বিশ্বাস করে আবার সত্য প্রত্যাখ্যান করে, অতঃপর তাদের সত্য প্রত্যাখ্যান-প্রবৃত্তি বেড়ে যায়। আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না। [নিসা : ১৩৭]

আল্লাহপাক আমাদেরকে সঠিক সময়ে সঠিক ভাবে তওবা করার তওফীক দান করুন। আমীন।

পর্ব ০৯

হাদীছের আলোকে শবে বরাত - ১



শবে বরাত সম্পর্কে বর্তমানের কিছু স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে যে, শবে বরাত সম্পর্কীয় যেসব হাদীছ পাওয়া যায়, সেগুলো মওজু তথা মনগড়া ও জাল হাদীছ। এ ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে তারা শবে বরাতের ফজীলতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বসে। এমনকি এ রাতে জাগরণ থেকে ইবাদত-বন্দেগী, যিকির, তেলাওয়াতসহ সকল নফল ইবাদত করাকে বিদআত মনে করে।

২।

শবে বরাত সম্পর্কে হাদীছের কিতাবসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে কিংবা হাদীছ শাস্ত্রে সম্যক ধারণা থাকলে একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে তাদের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি অমূলক ও ভ্রান্ত এবং হাদীছ শাস্ত্র সম্পর্কে অজ্ঞতাপ্রসূত। এমনকি তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা শরীয়তের বিধানবলী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ সাহাবা ও তাবেয়ীন আইম্মায়ে মুজতাহেদীনসহ সকল সলফে সালেহীন এবং তাদের থেকে পরম্পরা সূত্রে প্রাপ্ত আমলের সাথে অসংগতি ও বিরোধপূর্ণ।

৩।

মূলতঃ সাহাবায়ে কেরামের এক জলীলুল কুদর দল থেকে বিভিন্নসূত্রে শবে বরাতের ফজীলত সম্পর্কীয় বহু বর্ণনা হাদীছ গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান। যেসব বর্ণনার সূত্রগুলো কিছু সহীহ আর কিছু হাসান তথা সহীহের অন্তর্ভুক্ত আর কিছু জঈফ যা পরম্পর পরম্পরকে শক্তিশালী করে আমলের যোগ্য করে তোলে। যদিও স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকটি বর্ণনাকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করা যায় না, কিন্তু বেশ কিছু বর্ণনা ছিকাহ রাবী তথা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে বর্ণিত এবং তার অনুকূলে আরো রেওয়ায়েত বা হাদীছ বিদ্যমান থাকায় নিঃসন্দেহে তা সহীহ এর মানে উন্নীত হয়। এই কারণেই শরীয়তে শবে বরাতের ফজীলত ভিত্তিহীন বলার কোন অবকাশ নেই।

হাদীছ শাস্ত্রের কিছু নীতিমালাঃ

উপরোক্ত বিষয়গুলো বোধগম্য হওয়ার জন্য প্রথমে হাদীছ শাস্ত্রের কিছু নীতিমালা পেশ করা হচ্ছে।

হাসান হাদীছঃ

ক)

শবে বরাতের ব্যাপারে (حسن) ‘ হাসান ’ স্তরের এমন কিছু হাদীছ তো অবশ্যই পাওয়া যায় যেসব হাদীছের সহযোগিতায় ও সমর্থনে অন্যান্য আরও হাদীছও বিদ্যমান। আর হাদীছশাস্ত্রের মূলনীতি মতে ‘ হাসান ’ স্তরের হাদীছের সমর্থনে ও সহযোগিতায় অন্য আরো রেওয়ায়েতে তথা বর্ণনা পাওয়া গেলে সেই হাদীছ হাসান স্তর থেকে উন্নীত হয়ে সহীহ স্তরের মর্যাদা লাভ করে।

খ)

যেমন এ প্রসঙ্গে হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেনঃ

“ হাসান সনদ দ্বারা বর্ণিত হাদীছ হয় একটি হবে অথবা তার সমর্থনে অন্য হাদীছও থাকবে। যদি মর্যাদার দিক থেকে উভয়টি সমান হয় কিংবা তার চেয়ে উচ্চস্তরের হয়, তাহলে বর্ণিত উভয় হাদীছ একে অপরের সমর্থনে সহীহ এর স্তরে পৌঁছে যায়। ”

## মুরসাল হাদীছঃ

১।

মুরসাল হাদীস হল সেসব রেওয়ায়েত যেখানে একজন তাবেঈ সরাসরি রসূলের (সঃ) কোন কর্ম বা উক্তির বর্ণনা দেন, অর্থাৎ কোন সাহাবা থেকে তিনি শুনেছেন তিনি তা উল্লেখ করেন নি।

২।

শবেবরাত সম্পর্কে কোন কোন হাদীছ মুরসাল (مرسل) পাওয়া যায়। আর হানাফী মাযহাবসহ বহু ইমামগণের মতে মুরসাল হাদীছ সহীহ এবং শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এখানে আমরা সংক্ষেপে মুরসাল হাদীস দলীল হওয়ার পক্ষে ইমামগণের মতামত উল্লেখ করব।

৩।

ইমাম মালিক এবং মালিকি মাযহাবের সকল প্রসিদ্ধ ফকীহগণের মত হল, নির্ভরযোগ্য বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির মুরসাল হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং এর উপর আমল করা যাবে

( তাজরীদ আল তামহীদ লিমা ফি আল মুয়াত্তা মিনাল আসানিদ, ইউসুফ বিন আব্দুল্লাহ ইবনে আবদুল বার, কায়রো, ১৩৫০, ১:২ )

তাদের কেউ কেউ আবার মুরসাল হাদীসকে মুসনাদ হাদীসের চেয়ে উত্তমও বলেছেন।

৪।

ইমাম আবু হানিফাও ইমাম মালিকের মতই মুরসাল হাদীসকে সহীহের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, চাই এর সমর্থনে অন্য কোন সহীহ হাদীস থাকুক বা না থাকুক।

( ইমাম সুয়ুতী )

৫।

ইমাম শাফিঈ মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাঁর কিতাব " আল রিসালাহ " তে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং কিছু শর্ত দিয়েছেন। সেগুলো হলঃ

ক) এর সমর্থনে অন্য সনদে মুসনাদ হাদীস থাকতে হবে অথবা মুরসাল হাদীসের বক্তব্যের সাথে অধিকাংশ স্কলারদের মতের মিল থাকতে হবে।

খ) আর যে রাবী মুরসাল হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে উত্তম তাবেঈ হতে হবে।

( আল রিসালাহ, ইমাম শাফী, আহমদ শাখির এর সংস্করণ, কায়রো, ১৩৫৮/১৯৪০, পৃঃ৪৬১-৪৭০ )

৬।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) মুরসাল হাদীস গ্রহণ করেছেন যদি তার বিপরীতে কোন কিছুই পাওয়া না

যায় এবং তিনি কিয়াসের চেয়ে মুরসাল হাদীসকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

( ইলাম আল মুয়াক্কিন, ইবনুল কায়্যিম, দ্বিতীয় সংস্করণ, দারুল ফিকর, বায়রুত, ১৩৯৭/১৯৭৭, ১:৩১ )

৭।

এজন্যই আল্লামা ইমাম নববী (রহঃ) বলেনঃ

“ মুরসাল হাদীসকে ইমাম মালেক (রহঃ) ও ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহীহ – এর শ্রেণীভুক্ত করেছেন। ”

( তাকরীবু লিন নববীঃ খ-১ , পৃ-১৯৮ )

৮।

এ ব্যাপারে আল্লামা সাইফুদ্দীন আল আমেদী (রহঃ) বলেনঃ

“ মুরসাল হাদীস এর গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপারে ইমামগণ মতবিরোধ করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মালিক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) এর প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী উক্ত হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। ”

( আল আহকাম ফি উসূলিল আহকামঃ খ-২ , পৃ-১৭৭ )

৯।

আবু দাউদ (রহঃ) এর মতেও মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য, শর্ত হল, ঐ বিষয়ে কোন মুসনাদ হাদীস পাওয়া যাবে না, আর যদি যাই তাহলে তা মুরসাল হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

( সুরুত আল আইম্মাহ আল খামসাহ, আল হাজিমি, আল কাউসারী সংস্করণ, কায়রো, পৃ - ৪৫ )

১০।

খতীব আল বাগদাদী (রহঃ)ও মুরসাল হাদীসকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন যদি তা উত্তম তাবেঈ থেকে বর্ণিত হয় অথবা তার সমর্থনে মুসনাদ হাদীস পাওয়া যায়।

( আল কিফায়া ফি ইলম আল রিওয়ায়াহ, খতীব বাগদাদী, হায়দারাবাদ, ১৩৫৭, পৃ - ৩৮৭ )

১১।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী থেকে ইরসাল করা হলে সেই মুরসাল হাদীসকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন।

( মিনহাজ আল সুন্নাহ আন নববীয়াহ ফী নকদ কালাম আল শিয়া ওয়াল ক্বাদারিয়াহ, ইবনে তাইমিয়া, মাকতাবাহ আল আমিরীয়াহ, বুলাক, ১৩২২, ৪:১১৭ )

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) মুরসাল হাদীসকে গ্রহণযোগ্য ও সহীহ বলে রায় দিয়েছেন। আর ইমাম শাফিঈ গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কিছু

শর্ত দিয়েছেন। উল্লেখ্য, শবে বরাতের মুরসাল হাদীস গুলো শর্তগুলো পূরণ করে।

### যঈফ বা দুর্বল হাদীসঃ

১।

যে হাদীছের রাবী হাসান হাদীছের রাবীর গুণ সম্পন্ন নন তাকে যঈফ হাদীস বলা হয়।  
ভূয়র পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কথাই যঈফ নয় বরং রাবীর দুর্বলতার কারণে হাদীছকে  
যঈফ বলা হয়।

২।

শবে বরাতের ফযীলত বিষয়ে কিছু জ' ঈফ তথা দুর্বল হাদীছও রয়েছে।

৩।

হাদীছ শাস্ত্রের নীতিমালা মতে য' ঈফ (ضعيف) হাদীছ যদি বিভিন্ন সূত্রে (সনদে) বর্ণিত হয়ে তখন ওই  
হাদীছটি একাধিক সূত্রে বর্ণনা করার কারণে সমষ্টিগতভাবে হাসান (حسن) এর স্তরে পৌঁছে যায়। আর তখন  
সর্ব সম্মতিক্রমে ওই হাদীছটি শরীয়তের দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং সকলের আমলযোগ্য হাদীছ হিসেবে  
বিবেচিত হয়।

৪।

আল্লামা যফর আহমদ উছমানী (রহঃ) নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহ থেকে চয়ন করে সংক্ষিপ্ত আকারে উক্ত কথাটি  
এভাবে তুলে ধরেনঃ

“ যঈফ হাদীছের বর্ণনারীতি যদি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয় এমনকি এক সূত্রেও যদি বর্ণিত হয় পরিণামে তা  
হাসান স্তরে উপনীত হয় এবং তার দ্বারা দলীলও পেশ করা যায় ”

( ক্বাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীছ )

### ফাযাইলের ক্ষেত্রে যঈফ হাদীসঃ

১।

উপরন্তু হাদীছ বিশারদগণের মতে য' ঈফ তথা দুর্বল হাদীছ অত্যধিক দুর্বল না হলে ফাযাইলে আ মাল এর  
ক্ষেত্রে তার উপর আ' মল করা যায়, এর ভিত্তিতে সওয়াবও পাওয়া যায় এবং উলামা মুহাদ্দিসদের এই বিষয়ে  
ইজমা আছে। বড় বড় ইমাম এবং মুহাদ্দিসীনরা তাদের বিভিন্ন কিতাবে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা  
করেছেন। অথচ শবে বরাত সম্পর্কীয় সকল হাদীছ য' ঈফ নয়।

### ২। ইমাম বুখারী (রহঃ)

আমীরুল মুহাদ্দিসীন ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীসের উস্তাদ ছিলেন এবং স্পষ্টভাবেই সহীহ ও দুর্বল হাদীসের  
মধ্যে পার্থক্য জানতেন। কিন্তু তবুও তিনি তার একটি ফাযাইলের কিতাবে দুর্বল হাদীস বর্ণনা করেছেন। তার  
বিখ্যাত কিতাব " আল আদাব আল মুফরাদ ", এ কিতাবে প্রচুর যঈফ হাদীস রয়েছে কিন্তু এটি জানার পরও

কিতাবটি যুগ যুগ ধরে উম্মতরা পড়ে আসছে এবং অনুসরণ করে আসছে, কারণ এই কিতাবটিতে ফাযাইলের বর্ণনা আছে। এমনকি এই কিতাবের কিছু অধ্যায়ে কোন সহীহ রেওয়ায়েতও নেই।

আল্লামা শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ আদাব আল মুফরাদ এর সনদের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করছেন তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ " ফাযলুল্লাহ আস সামাদ " এ।

### ৩। ইমাম নববী (রহঃ)

ইমাম নববী (মৃঃ ৬৭৬ হিঃ) তার আল আযকারে যঈফ হাদীসের উপর আমল করার বিভিন্ন দিক আলোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ

কিছু কিছু ক্ষেত্রে (শর্তসাপেক্ষে) যঈফ হাদীসের উপর আমল করা যায়।

### ৪। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ)

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকিহ হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

"সকলেই একমত যে যঈফ হাদীছ ফজিলত হাসিল করার জন্য আমল করা জায়েজ আছে।"

(আল মওজুআতুল কবীর, ১০৮ পৃষ্ঠা)

### ৫। ইমাম ইবনে হুমাম (রহঃ)

এ প্রসঙ্গে হযরত ইমাম ইবনে হুমাম রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন,

" যঈফ হাদীছ যা মওজু নয় তা ফজিলতের আমল সমূহে গ্রহণযোগ্য।"

(ফতহুল ক্বাদীর)

### ৬। ইমাম মুসলিম (রহঃ)

ইমাম আহমদ এবং সালাফের অন্যান্যদের মতের মত ইমাম মুসলিমও দুর্বল হাদীসকে প্রত্যাখান করেন নি।

( নববী, শরহে সহীহ মুসলিম (ভূমিকা); ইবনুল কায়্যিম, ইলাম আল মুওয়াক্কিন (১/৩১); ); সাখাবী, আল কওল আল বাদী (পৃ-৪৭৪) , ইবনে রজব, শরহে ইলাল আল তিরমিযী (১/৭৫-৭৬)

### ৭। ইমাম ইবনে আরাবী (রহঃ)

ইমাম ইবনে আরাবী ফাযাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করেছেন।

( ইবনে আল আরাবী, আরিদাত আল আহওয়াযী (১০/২০৫); ফাতহুল বারী (১০/৬০৬) যা মুহাম্মাদ আওয়ামা আল কওল আল বাদী (পৃ - ৪৭২) এ উল্লেখ করেন)

### ৮। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মঈন (রহঃ) ( ইমাম বুখারীর উস্তাদ)

তিনিও ফাযাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন।

( তাবীযুনাল আসার; ফাতহুল মাগহীত )

### ৯। ইমাম আবু শামা মাকদীসী (রহঃ)

তিনি ফাযাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং এটি মুহাদ্দিসীনদের সিদ্ধান্ত বলেও মত প্রকাশ করেছেন।

( তাওযীযুন নাদার)

### ১০। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) তাঁর কিতাব " আল কায়দা আল জলীলা ফিত তাওয়াসসালি ওয়াল ওয়াসিলা ", মুহাক্কিক ড রাবিয়া বিন হাদী উমাইর আল মুযখালী, প্রফেসর, ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারাহ, এর ৮ম অধ্যায়ে যঈফ হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং অধিকাংশ উলামা কেরামের মতামত উল্লেখ করেছেন এবং সাথে নিজের মতও প্রদান করেছেন।

ইবনে তাইমিয়া ৪৭৮ অনুচ্ছেদ (প্যারা) এ উল্লেখ করেনঃ

কোন আমল শরীয়তের দলীল দ্বারা প্রমাণিত থাকলে, এবং ফাযাইলের ক্ষেত্রে (এরকম আমলের) হাদীস বর্ণিত হলে একে মিথ্যা বলা যাবে না, এটা সম্ভব যে ফাযাইলটা সত্য, এবং কোন ইমামই দুর্বল হাদীস দ্বারা ফাযাইলটিকে ওয়াজিব বা মুস্তাহাব বলেন নি, এবং যারা বলেছেন তারা ইজমার বিরুদ্ধে।

এখান থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে, ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)ও ফাযাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের পক্ষে মত প্রদান করেছেন।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কিতাব "আল কালিমুত তাযীব" এ প্রচুর দুর্বল হাদীস রয়েছে যা পরবর্তীতে আলবানী "সহীহ আল কালিমুত তাযীব" এবং "যঈফ আল কালিমুত তাযীব" এ দুই ভাগে ভাগ করেন।

### ১১। ইমাম শাওকানী (রহঃ)

তাঁর মতে ফাযাইলের ক্ষেত্রে অনেক গুলো দুর্বল হাদীস এক করলে তা শক্তিশালী হয় এবং তার উপর আমল করা যায়।

( নায়লুল আওতার (৩/৬০))

তার বিখ্যাত কিতাব " তুহফাতুয যাকিরীন " এ প্রচুর পরিমাণে যঈফ হাদীস পাওয়া যায়।

### ১৪। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) (মৃঃ ১৮১ হিঃ)

তাঁর মতে ফাযাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস বর্ণনা করা যায়।

(সুযুতীর তাদরীব আল রাবী)



১৫। এ প্রসঙ্গে আল্লামা যফর আহমদ ওছমানী' র রচিত গ্রন্থ “ ক্বাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীছ ” এর ভাষ্য নিম্নরূপঃ

“ দুররে মুখতার এ রয়েছে যে, ফাযাইলে আমা' ল এর ক্ষেত্রে য' ঈফ হাদীছ এর উপর আমল করা যাবে। ব্যাখ্যাকার ইবনুল আবেদীন বলেনঃ যে ফজীলত আমলের মাধ্যমে অর্জিত হয়, সেই ফজীলত লাভের উদ্দেশ্যে (য' ঈফ হাদীছ এর উপর আ' মল করা যাবে)। ”

( ক্বাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীছঃ পৃ - ৯২)

### শবে বরাতের হাদীস এবং সাহাবীঃ

তাছাড়া শবে বরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হাদীছসমূহের বর্ণনাকারীদের মধ্যে অনেক বড় বড় (এক ডজনের মত ) সাহাবাও রয়েছেন। যাদের কয়েকজনের পবিত্র নাম নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

- ক) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রঃ)
- খ) হযরত আলী (রঃ)
- গ) হযরত আয়শা (রঃ)
- ঘ) হযরত আবু হুরায়রা (রঃ)
- ঙ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আ' মর (রঃ)
- চ) হযরত আবু মুসা আশআরী (রঃ)
- ছ) হযরত আউফ ইবনু মালিক (রঃ)
- জ) হযরত মুআয ইবনু জাবাল (রঃ)
- ঝ) হযরত আবু ছালাবাহ আল খুসানী (রঃ)
- ঞ) কাছীর ইবনে মুররা আল হাজরমী (রঃ)

### সার কথাঃ

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কোন কথাই দুর্বল নয়। মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীসের ক্ষেত্রে সহীহ, হাসান, যঈফ ইত্যাদি যে পরিভাষা ব্যবহার করেন তা সনদ তথা বর্ণনাকারীগণের ধারাবাহিকতা ও গুণাগুণ বিবেচনায়। উসূলে হাদীসের কিতাবে আছে- তিন কারণে হাদীস যঈফ হয়ে থাকে।

১. বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণতা, স্মরণশক্তি ও সংরক্ষণ ক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমালোচিত হলে।

২. বর্ণনাকারী অপরিচিত হলে। কারণ এতে জানা যায় না তিনি নির্ভরযোগ্য কি না?

৩. বর্ণনাধারা (সনদ) মুত্তাসিল বা সংযুক্ত না হলে। কারণ এতে জানা যায় না যে, মধ্যস্থান হতে যে বর্ণনাকারীর নাম বাদ পড়েছে তিনি বিশ্বস্ত কি না?

মুহাদ্দিসীনে কিরাম হাদীস সংগ্রহ ও সংরক্ষণে বর্ণনাকারীদের সার্বিক গুণাবলীর চুল-চেরা বিশ্লেষণ করেন এবং সাথে সাথে সনদের সবলতা ও দুর্বলতার দিকটাও তুলে ধরেন। সবলতা ও দুর্বলতা নির্ণয়ে সব মুহাদ্দিসীনের নীতি আবার এক নয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীস গ্রহণে যেরূপ কঠোর শর্তারোপ করেছেন অন্যরা তা করেন নি। তাইতো দেখা যায় ইমাম মুসলিম (রহঃ)-এর বিবেচনায় যে সব হাদীস সহীহ, ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর বিবেচনায় তার কোন কোনটি সহীহ নয়। স্বয়ং ইমাম মুসলিম (রহঃ) বলেন, যে সব হাদীস মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট সহীহ ও নির্দোষ হিসেবে স্বীকৃত কিন্তু আমাদের আলোচিত ব্যক্তি (ইমাম বুখারী রহঃ)-এর নিকট যঈফ (দুর্বল) হিসেবে চিহ্নিত- যদি আমরা এগুলোর পরিপূর্ণ সংখ্যা হিসেব করার চেষ্টা করি

তাহলে নিশ্চয়ই আমরা অসমর্থ হয়ে পড়বো এবং সবগুলোর আলোচনা করাটাও আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে না (মুকাদ্দমায়ে সহীহ মুসলিম)।

যাই হোক, মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাদের অনুসৃত নীতির ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে সবল হাদীসকে সবল এবং দুর্বল হাদীসকে দুর্বল বলে দিয়েছেন। কিন্তু তারা এ কথা বলেন নি যে, দুর্বল হাদীস (যঈফ) কোন ক্ষেত্রেই গ্রহণীয় নয়। মূলত দুর্বল হাদীস আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণীয় বলেই উলামা মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরীনে কিরাম তাদের স্ব স্ব কিতাবে ফযীলত ও আমলের বর্ণনায় এ ধরনের হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকেন নি। শবে বরাত সম্পর্কে বর্ণিত যে সকল হাদীসের সনদ দুর্বল এসব হাদীসতো সহীহ হাদীসের পাশাপাশি বিভিন্ন কিতাবে স্থান পেয়েছে। এর দ্বারা শবে বরাতের সবিশেষ ফযীলত ও আমলের গুরুত্বের দিকটাই প্রমাণিত হয়।

উসূলে হাদীস সম্পর্কে যাদের ভাল ধারণা আছে, তার অবগত আছেন যে, হাদীসের দুর্বলতার মাত্রা সব সময় একই হয় না, কি কারণে হাদীসটি দুর্বল তার উপর হাদীসের দুর্বলতার মাত্রা এক এক ক্ষেত্রে এক এক রকম হয়ে থাকে। যেমন কোন রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে একটি হাদীস দুর্বল, আর কোন রাবী মিথ্যুক এবং হাদীস জালকারী বলে সুপরিচিত, এজন্য একটি হাদীস দুর্বল - এই দুই ক্ষেত্রে দুর্বলতার মাত্রা কখনোই এক নয়। হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী, যদি কোন ফাজাইলের ব্যাপারে অনেকগুলো হাদীস বা রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, এবং যদি তাদের মধ্যে অধিকাংশ রেওয়ায়েত দুর্বলও (কম মাত্রায়) থাকে তবুও সবগুলো রেওয়ায়েতকে একত্রে করে সেই ফজীলত বা ফাজাইলকে গ্রহণ করা যাবে

সুতরাং যারা শবে বরাতের হাদীস সংক্রান্ত কিছু দলিলকে যঈফ হাদীছ বলে শবে বরাত পালন করা বিদ্যাত বলে তাদের এধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভুল।

### শেষ কথাঃ

যেসব আহলে হাদীস বা সালাফী ভাইরা শবে বরাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে চান তাদের জ্ঞাতার্থে বলছিঃ

১। শবে বরাত সম্পর্কিত অনেক হাসান হাদীছ পাওয়া যায় যেগুলো উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী একে অপরকে শক্তিশালী করে সহীহ এর পর্যায়ে চলে যায়।

২। শবে বরাত সম্পর্কিত অনেক দুর্বল হাদীছ পাওয়া যায় যেগুলো বিভিন্ন সনদে বর্ণিত থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী একে অপরকে শক্তিশালী করে হাসান এর পর্যায়ে চলে যায়।

৩। তদুপরি মুহাদ্দিসে কেরামের ইজমা আছে যে, ফাজাইলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীসের উপর আমল করা যায়।

আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন উপরের তিনটি নীতিমালার কোনটিকে আপনারা অস্বীকার করছেন যে যার ফলে আপনাদের কাছে শবে বরাতকে বিদ্যাত মনে হয় এবং এর ফাযায়েলকে রীতিমত অস্বীকার করে চলেছেন?

পরবর্তী পর্ব থেকে আমরা শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীসগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করব এবং সর্বমোট ১২ টি হাদীস উল্লেখ করে উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী হাদীসগুলো সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মতামত অর্থাৎ কোনটি সহীহ, কোনটি হাসান, আর কোনটি দুর্বল তা উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

যেসব লোক দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে মিথ্যাচারের আশ্রয় নিচ্ছেন দিনের পর দিন, তাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআনে কারীমের একটি আয়াত পেশ করে আজ শেষ করব।

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত। {সূরা আলে ইমরান-৬১}

পর্ব ১০

হাদীছের আলোকে শবে বরাত - ২

গত পর্বে আমরা হাদীস শাস্ত্রের কিছু নীতিমালা সম্পর্কে আলোকপাত করেছিলাম।

এ পর্যায়ে সাহাবায়ে কেরাম (রঃ) থেকে শবে বরাত সম্পর্কিত বর্ণিত হাদীছগুলোর মূল বক্তব্য ( متن ) এবং সেগুলোর সূত্র ( سند ) সম্পর্কে আলোচনা পর্যালোচনা আমরা সবিস্তারে উপস্থাপন করছি।

প্রথম হাদীছঃ ( حسن لذاته ) (হাসান লিয়াতিহী)

হযরত মু' আয ইবনু জাবাল (রঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তা' আলা শা' বান মাসের পনের তারিখ রাতে সৃষ্টিকুলের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করে সকলকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু মুশরিক এবং হিংসুক ছাড়া।

আলোচ্য হাদীছটি

- ১। ইমাম তাবরানী আল-কাবীরে এবং আল-আওসাতে
- ২। ইমাম ইবনে হিব্বান সহীহ ইবনে হিব্বানে
- ৩। ইমাম বায়হাকী শুআবুল ঈমানে
- ৪। হাফেয আবু নুআইম তার হিলয়া গ্রন্থে
- ৫। হাফেয হায়ছামী মাজমাউয যাওয়ায়েদে

সংকলন করেছেন।

হাদীছটির সনদ পর্যালোচনাঃ

ইবনে হিব্বানের সূত্রে এই হাদীছে দশজন বর্ণনাকারী রয়েছেনঃ

- ১। মুহাম্মদ বিন আল মাআফী

তিনি সকলের নিকট নির্ভরযোগ্য।

( দেখুন কিতাবুছ ছেকাত )

- ২। ইবনে কুতায়বা

তিনি মুহাদ্দিছীনের দৃষ্টিতে ثقة ছিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য।

( দেখুন আল আনসাব )

### ৩। হিশাম ইবনে খালিদ

তার ব্যাপারে সমকালীন হাদীছ পর্যালোচক শুআইব আল আরনাউত বলেনঃ

“ তিনি নির্ভরযোগ্য, প্রচুর ছিক্বাহ রাবীগণ তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন,

ক) আবু আলী আল হায়্যানী

খ) ইমাম যাহাবী

প্রমুখ তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

গ) ইবনে হিব্বান কিতাবুছ ছিক্বাতে বলেন, কোন সমালোচনা আমার জানা নেই। ”

( তাহরীরঃ খ-৪ , পৃ-৩৯ )

### ৪। উতবা বিন হাম্মাদ

এর সম্পর্কে হাদীছ পর্যালোচকগণ বলেছেনঃ

ক) হাফেয বলেনঃ তিনি সত্যবাদী।

খ) আবু আলী নিসাপুরী এবং খতীব বাগদাদী বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য।

গ) ইবনে হিব্বান তাঁকে কিতাবুছ ছিক্বাতে উল্লেখ করেছেন।

ঘ) শুয়াইব আরনাউত তাঁকে ছিক্বাহ বলেছেন।

তাঁর থেকে অসংখ্য ছিক্বাহ মুহাদ্দিস হাদীছ নিয়েছেন।

( দেখুন তাহরীরঃ খ-২ , পৃ-৪২৯ )

### ৫। আলআওয়ায়ী

তিনি সর্বসম্মতিক্রমে সুখ্যাত ইমাম ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

( দেখুন আল জরহ ওয়াততাদীল )

### ৬। আব্দুর রহমান ইবনে ছওবান।

তাঁর ব্যাপারে হাদীছ পর্যালোচকদের কিছু সমালোচনা থাকলেও তাঁর ব্যাপারে শায়খ আরনাউত্ব সুস্পষ্টভাষায় বলেন,

“ তিনি সত্যবাদী, তাঁর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য কেননা

ক) আবু হাতিম

খ) দুহাইম

গ) আব্দুর রহমান বিন সালাহ আমর বিন আলী

প্রমুখ ﷺ ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।

ঘ) ইবনে হিব্বান তাঁকে কিতাবুছ ছিকাতে উল্লেখ করেছেন।

ঙ) শায়খে বোখারী আলী ইবনিল মাদীনী ইমাম আবু যুরআহ

চ) ইমাম আবু দাউদ আল আজলী

ছ) ইয়াকুব ইবনে শাহীন

প্রমুখ তাঁর হাদীছ গ্রহণযোগ্য হওয়ার ক্ষেত্রে “ কোন অসুবিধা নেই ” বলে মন্তব্য করেছেন। ”

( দেখুন তাহরীরঃ পৃ – ২/ ৩১০ )

৭। ছাবেত ইবনে ছওবান

তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ছিকাহ নির্ভরযোগ্য।

( দেখুন আততাকরীবঃ ৮১১ )

৮। ইমাম মাকহুল

তিনি প্রসিদ্ধ ইমাম ও ছিকাহ হওয়ার মধ্যে কারো দ্বিমত নেই।

তাঁর ব্যাপারে ইবনু হাজার বলেনঃ

“ নির্ভরযোগ্য তবে ইরসাল বেশি করতেন। ”

( উস্তাদের নাম বিলুপ্ত করে তার উপরন্তু ব্যক্তি থেকে হাদীছ বর্ণনা করাকে ইরসাল বলে। )

৯। মালেক ইবনে ইখামের

তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ছিকাহ।

মুআয বিন জাবালের সঙ্গী। তবে রসূলের ইত্তিকালের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

তাঁর ব্যাপারে “ আল-কাশেফ ” গ্রন্থে আছে,

“ তিনি হযরত মুআযের সঙ্গি, সাহাবী নন, নির্ভরযোগ্য। ”

( দেখুন কাশিফঃ ১/২৮১ )

১০। হযরত মুআয (রঃ)

রসূল (সঃ) এর বিশিষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ ফক্বীহ সাহাবী।

( দেখুন আততাকরীব )

হাদীছটি সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের অভিমতঃ

প্রথম অভিমতঃ

হাফিয নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবু বকর আল হাইসামী (মৃঃ ৮০৭) তাঁর ‘ মাজমাযুয যাওয়ায়িদ ’ নামক গ্রন্থে বলেছেন,

“ উক্ত হাদীছটি তাবরানী তাঁর ‘ আল-মুজামুল কাবীর ’ এবং ‘ আওসাত ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। উভয় গ্রন্থে রাবী ছিকাহ তথা বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ”

( মাজমাযুয যাওয়ায়িদঃ খ-৮ , পৃ-৬৫ )

দ্বিতীয় অভিমতঃ

হাফিয ইবনে রজব আল হাম্বলী (রহঃ) মু’ আয ইবনু জাবাল (রঃ) এর বর্ণিত এ হাদীছটি বর্ণনা করার পর বলেন, ইবনু হিব্বান হাদীছটিকে সহীহ (বিশুদ্ধ) আখ্যা দিয়েছেন। আর নির্ভরযোগ্যতার জন্য এটিই যথেষ্ট।

( লাতাইফ আল মারিফঃ ইবনে রজব, ১/২২৪ )

হাদীছ পর্যালোচক আদনান আবদুর রহমান বলেন, উক্ত হাদীছটি ফাযায়িলুল আওকাত অধ্যায়ে ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেছেন। আর তার সনদ হাসান।

তৃতীয় অভিমতঃ

আলোচ্য হাদীছ সম্পর্কে তাবরানী রচিত المعجم الكبير আলমু’ জামিল কবীর গ্রন্থের মুহাক্কিক এবং বিশিষ্ট হাদীছ পর্যালোচক বলেনঃ

“ শবে বরাতের হাদীছটি বহু সূত্রে বর্ণিত আছে। যারা সূত্রগুলো সম্পর্কে অবগত তাদের নিকট হাদীছটি নিঃসন্দেহে সহীহ বলে পরিগণিত। বিশেষ করে যখন তার কিছু সূত্র حسن لذاته হাসান লিয়াতিহী তথা সহীহ যেমন হযরত মুআয (রঃ) ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের সূত্রগুলো। ”

( দেখুনঃ আলমু’ জামুল কবীরের টিকাঃ খঃ ২০, পৃঃ ১০৮ )

উপরোক্ত মন্তব্যের সারমর্ম হলো মু’ আয (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত শবে বরাতের হাদীছটি মতনের দিক দিয়ে সহীহ তবে তার সনদটি হাসান লিয়াতিহী।

চতুর্থ অভিমতঃ

আলোচ্য হাদীছটির সূত্র পর্যালোচনা করে সময়কালের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ নাসিরউদ্দীন আলবানীমন্তব্য করেন এভাবেঃ

“ হাদীছটি মূল মতনের (মূল বক্তব্য) দিক দিয়ে সহীহ সাহাবায়ে কেরামের একটি বড় জামাআত থেকে বিভিন্ন সূত্রে হাদীছটি বর্ণিত। যা পরস্পরকে শক্তিশালী করে তোলে। যে সকল সাহাবী থেকে হাদীছটি বর্ণিত তাঁরা হচ্ছেন



ক) মুআ' য ইবনে জাবাল (রঃ)  
খ) আবু ছা' লাবাহ (রঃ)  
গ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রঃ)  
ঘ) আবু মুসা আশআরী (রঃ)  
ঙ) আবু হুরায়রা (রঃ)  
চ) আবু বকর সিদ্দীক (রঃ)  
ও  
ছ) হযরত আয়েশা (রঃ)। ”

( সিলসিলাতুল আহাদিসা সহীহাঃ খ-৩ , পৃ-১৩৮ )

উপরে বর্ণিত সবক' টি বর্ণনাকারীর হাদিস তিনি তার কিতাবে আনার মাধ্যমে সুদীর্ঘ আলোচনার পর শেষে তিনি বলেন-

সারকথা হল এই যে, নিশ্চয় এই হাদিসটি এই সকল সূত্র পরম্পরা দ্বারা সহীহ এতে কোন সন্দেহ নেই। আর সহীহ হওয়া এর থেকে কম সংখ্যক বর্ণনার দ্বারাও প্রমাণিত হয়ে যায়, যতক্ষণ না মারাত্মক কোন দুর্বলতা থেকে বেঁচে যায়, যেমন এই হাদিসটি হয়েছে। আর যা বর্ণিত শায়েখ কাসেমী থেকে তার প্রণীত “ ইসলামুল মাসাজিদ ” গ্রন্থের ১০৭ নং পৃষ্ঠায় জারাহ তা' দীল ইমামদের থেকে যে, “ শাবানের অর্থ মাসের রাতের কোন ফযীলত সম্পর্কে কোন হাদিস নেই মর্মে ” সেই বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যাবে না। আর যদি কেউ তা মেনে নেয় সে হবে ঝাঁপিয়ে পড়া(ঘারতেড়া) স্বভাবের আর তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও গবেষণা-উদ্ভাবনের কোন যোগ্যতাই নেই এরকমভাবে যেমন আমি করলাম।

( সিলসিলাতুস সাহিহাহর ৩ নং খন্ডের ১৩৫ নং পৃষ্ঠা )

**পঞ্চম অভিমতঃ**

ইমাম শামসুদ্দীন আয যাহাবী (রহঃ) হাদীছটি সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন হাদীছটির সনদে মাকহুল নামক বর্ণনাকারীর সাথে মালিক ইবনু যুখামির এর সাক্ষাৎ হয়নি এ দৃষ্টিকোণে মু' আয ইবনু জাবাল (রঃ) এর হাদীছটি মুনকাতি ।

**এ অভিমতের পর্যালোচনাঃ**

১।

বস্তুত ইমাম আয-যাহাবীর এই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ সঠিক নয় । কারণ হাদীছটির সনদে সকল বর্ণনাকারীই ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য। তাছাড়া হাদীছটির সমর্থনে আরো হাদীছও পাওয়া যায় বিধায় হাদীছটি নিঃসন্দেহে সহীহ এর স্তরে পৌঁছে গিয়েছে। যেমনটি দ্বিতীয় অভিমতের হাদীছ পর্যালোচক আদনান আব্দুর রহমান বলেছেন।

২।

উল্লেখ্য, মাকহুল রাবী যে মালেক ইবনু যুখামিরের সাক্ষাৎ পাননি যেমনটি যাহাবী বলেছেন তার সঠিক বিবরণটি এরকমঃ

“ আমার ধারণা হলো, মাকহুল আবু মুসলিম খাওলানী মাসরুক এবং মালেক ইবনে যুখামিরের সাক্ষাৎ

পাননি। ”

বক্তব্যে বুঝা যায়, যুখামেরের সাক্ষাৎ না পাওয়া নিছক যাহাবীর ধারণা। তিনি এ ব্যাপারে নিশ্চিত নন। তদুপরি মাকহুল সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য অন্য হাদীছ পর্যালোচকগণ করেন নি।

উপরন্তু মাকহুল ছিলেন একজন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও ফিকহের ইমাম। এসব কথাকে এক সাথে মিলিয়ে বিবেচনা করলে হাদীছ শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী এমন নিছক ধারণা হাদীছটি সহীহ ও সঠিক হওয়ার বেলায় অন্তরায় হতে পারে না।

৩।

বিষয়টিকে সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন ইমাম ইবনে হাযম তাঁর ‘আহকাম’ গ্রন্থে, শায়খ তাহের আল জাযায়েরীর বরাতে। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

“ মুদাল্লিস দু’ প্রকার। প্রথম প্রকারের মুদাল্লিস হাফিয আদিল নির্ভরযোগ্য হাদীছের ইমাম। তিনি কখনো হাদীছের সূত্রে ইরসাল করেছেন আবার কখনো পূর্ণ সূত্র উল্লেখ করেছেন। আবার কখনো সূত্রের কোন রাবীকে বাদ দিয়ে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এসব কারণে এ প্রকারের মুদাল্লিসের বর্ণিত হাদীছ ক্ষতিকরও নয় এবং অগ্রহণযোগ্যও নয়। কেননা এটা তার দোষ-ত্রুটির অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু তাঁর যেসব হাদীছ (মুরসালান) বর্ণিত হয়েছে এবং সূত্রে বাদ দেয়ার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় একমাত্র তাঁর সেসব হাদীছ অগ্রহণযোগ্য। এবং যে সমস্ত হাদীছের বেলায় কোন রাবী বাদ দেয়ার নিশ্চিত প্রমাণ নেই সেসব হাদীছ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। অতএব, যেসব সূত্রে রাবী বাদ দেয়ার অকাট্য প্রমাণ নেই সেসকল হাদীছ গ্রহণ করা জরুরী ”

( দেখুনঃ তওজীহন নাযারঃ খঃ ২, পৃঃ ৫৭২ )

৪।

সুতরাং ইমাম মাকহুল শাম দেশের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও হাফিয। তাঁর ব্যাপারে হাফেয যাহাবী মন্তব্য করেছেন, “ আমার ধারণা মাকহুল যুখামেরের সাক্ষাৎ পাননি। ” শুধু এতটুকু কথার দ্বারা উল্লেখিত নীতিমালা অনুযায়ী আলোচ্য হাদীছটিকে অগ্রহণযোগ্য বলার অবকাশ নেই। বরং সহীহ এবং সঠিকই বলতে হবে।

৫।

সম্ভবত এ কারণেই বর্তমানযুগের কটরপন্থী হাদীছ পর্যালোচক নাসির উদ্দীন আলবানী হাদীছটিকে حديث صحيح “ সহীহ হাদীছ ” বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

৬।

ঠিক তাঁরই শিষ্য বর্তমান যুগের খ্যাতিমান হাদীছ পর্যালোচক শায়খ গুয়াইব আল আরনাউত্ব সহীহ ইবনে হিব্বান গ্রন্থের টীকায় এ হাদীছ সম্পর্কে “ হাদীছটি অন্যান্য হাদীছের সমর্থনে সহীহ এবং তার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ” বলে মন্তব্য করেছেন।

( দেখুন সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ১২/৪৮১ )

৭।

সঙ্গত কারণে শায়খ আলবানী মূল হাদীছের ব্যাপারে বিস্তারিত গবেষণার পর এভাবে মন্তব্য করেনঃ

“ নির্যাস কথা হলো, এ হাদীছটি তার সকল সূত্রগুলোর বিবেচনায় নিঃসন্দেহে সহীহ বলে সাব্যস্ত হয়। এর তুলনায় কম সংখ্যক সূত্র দ্বারাও হাদীছ সহীহ বলে সাব্যস্ত হয়। যদি কঠিন দুর্বলতা থেকে নিরাপদ থাকে। যেমনটি এ হাদীছের বেলায় রয়েছে। ”

( সিলসিলাতুল আহাদিসাস সহীহাঃ খ-৩ , পৃ-১৩৮ )

মোদ্দা কথাঃ

মুআ' য বিন জাবাল (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীছটির মূল বক্তব্য متن (মতন) নিঃসন্দেহে সহীহ এর অন্তর্ভুক্ত এবং হাদীছটির বিভিন্ন সূত্র حسن لذاته হাসান লিয়াতিহী যা সহীহের অন্তর্ভুক্ত বটে।

যেমনটি মন্তব্য করলেনঃ

শায়খ আলবানী,  
শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত,  
ইমাম হায্জামী,  
ইমাম তাবরানী,  
ইমাম ইবনে হিব্বান,  
আদনান আব্দুর রহমান প্রমুখ মনীষী।

আহলে হাদীস/সালাফী ভাইদের কাছে প্রশ্ন ও দাওয়াতঃ

প্রথমত, উপরে বর্ণিত হাদীসটির সনদ নিজে থেকেই হাসান পর্যায়ে এবং মতন সহীহ পর্যায়ে

দ্বিতীয়ত, হাদীসটির সমর্থনে আরও অনেক হাদীস থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এই হাদীসটি সহীহের পর্যায়ে চলে আসে।

অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসরাই এই হাদীসের তাহকীক করেছেন এবং একে সহীহ বলেছেন

অন্যদিকে হাদীসের তাহকীক তথা বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সালাফী/আহলে হাদীছ ভাইরা যার সবচেয়ে বেশি ভক্ত, যার কিতবাদি অনুবাদ করে আপনারা প্রচার করে থাকেন, সময়কালের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ নাসিরউদ্দীন আলবানীও (রহঃ) শবে বরাতে এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

আবার তাঁরই শিষ্য বর্তমান যুগের খ্যাতিমান হাদীছ পর্যালোচক শায়খ শুয়াইব আল আরনাউতুও এই হাদীসটিকে সহীহ এবং তার সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

তাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তাহলে কেন আপনারা বার বার বলেন যে, শবে বরাতে ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই??

উপরন্তু আপনাদের জ্ঞাতার্থে আরও বলছি, আপনাদের সবচেয়ে বড় গণ্যমান্য ইমাম, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)ও শবে বরাতে ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস গুলোকে তাহকীক করেছেন এবং এর ফযীলতক স্বীকার করেছেন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ

" এ রাতের ফজীলতে বেশ কিছু মারফু হাদীস এবং আছার বর্ণিত আছে যা প্রমাণ করে যে এ রাতটি ফযীলতপূর্ণ। পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ এ রাতে বিশেষভাবে সালাত আদায় করতেন। ... ..যে মতের উপর আমাদের মাযহাবের বা অন্যান্য মাযহাবের বহু সংখ্যক বরং বেশিরভাগ আলেমরয়েছেন তা হলো এই রাতটি অন্যান্য রাতের উপর ফযীলত রাখো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর স্পষ্ট কথার মাধ্যমে এটি জানা যায়। আর যেহেতু এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের আমল সেসকল হাদীসকে সত্যায়ন করে, এই রাতের কিছু ফযীলত সুন্নান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহতে উল্লেখিত রয়েছে তবে এ রাত সম্পর্কে কিছু জাল হাদীসও রয়েছে। "

( ইক্তিদাউস-সিরাত আল মুস্তাকীম )

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার এ উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন সহ সলফে সালাহীনরা অনেকেই এ রাতকে ফজীলতপূর্ণ হিসেবে রায় দিয়েছেন এবং এ রাতে বেশি বেশি ইবাদত করেছেন।

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তুহফাতুল আহওয়াজীতে বলেন,

" জেনে নাও শাবান মাসের মাঝ রাত সম্পর্কে প্রচুর হাদীস এসেছে যা একত্রে প্রমাণ করে যেবিষয়টির শরয়ী ভিত্তি রয়েছে। "

পরে তিনি একের পর এক বিভিন্ন রেওয়ায়েত উল্লেখ করে শেষে বলেনঃ

" অতএব এই সমস্ত হাদীস একত্রে তার বিরুদ্ধে দলীল যে দাবী করে শাবান মাসের মাঝ রাতের ফযীলত সম্পর্কে কোন হাদীস প্রমাণিত হয়নি আর আল্লাহই ভাল জানেন। "

( তুহফাতুল আহওয়াজী )

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ রাত সম্পর্কে আরও বলেনঃ

" অতএব যদি কোন ব্যক্তি একা একা সালাত আদায় করে তবে তার পক্ষে একদল সালাফকে পাওয়া যাবে এবং তার পক্ষে দলীলও রয়েছে। "

( মাজমুআয়ে ফাতওয়া )

এখন সালাফী বা আহলের হাদীসের ঐসব বন্ধুদের প্রতি দাওয়াত রইল, আপনারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), শায়খ আলবানী (রহঃ) এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরজ করতে চাই যে, আপনারা যদি শায়খ ইবনে বাযের (রহঃ) অনুসরণে বা নিজেদের তাহকীক মতো এই রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে পারেন তাহলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযীলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সব ধরণের বেদআত রসম-রেওয়াজ পরিহার করে নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন তারাই এমন কি অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা ভুলের সম্ভাবনার উর্ধ্বে নয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং বাতিলপন্থিদের মিশন সফল করতে সহায়তা দেওয়া কি সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি প্রয়োজন? এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আপনারা

আপনাদের মতটিকে খুব বেশি হলে একটি ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনায়ুক্তই মনে করেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতটিকে একেবারে ওহীর মতো মনে করেন না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা আর থাকে কি না?

আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) [মৃ. ৭২৮ হিঃ] এর ইক্তিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (রহঃ) [মৃ. ৭৯৫] এর লাতায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায (রহঃ) এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? যা হয়ত তিনি শবে বরাত নিয়ে জাহেল লোকদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, বাড়াবাড়ির প্রতিকার কোন বাস্তব সত্য অস্বীকার করে নয়, বরং সত্য বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

### শেষ কথাঃ

যদি শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন হাদীস না থাকত, তবে এই হাদীসটিই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত।

যদি অন্যান্য রাতের উপর এ রাতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই থাকবে, তবে বিশেষভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করারই বা কি প্রয়োজন? শুধু এই রাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমেই অন্যান্য রাতের উপর এর বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

উপরের হাদীস থেকে স্পষ্টতই এটা প্রমাণিত হয় যে, এ রাতে আল্লাহ পাক তাঁর বিপুল সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করেন। যে রাতে আল্লাহ বিশেষভাবে ক্ষমার ওয়াদা করেছেন, সেই রাতে কাকুতি মিনতি করে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এটাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া, তওবা করা বা যে কোন দোয়া করার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কোন ভাল আমলের মাধ্যমে দোয়াটিকে শক্ত করা যাতে দ্রুত কবুল হয়। বুখারী শরীফের তিন জন যুবকের কাহিনী হতে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যারা পাহাড়ের গুহাতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। পরে একজনের পরামর্শে প্রত্যেকের ভাল আমল উল্লেখ করে দোয়া করলে আল্লাহ তাদের মুক্ত করেন। তাছাড়া অনেক হাদীসেই নফল নামায পড়ে দোয়া করা, কোরআন তিলাওয়াত করে দোয়া করা, জিকির আযকার করে দোয়া করা ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং মধ্য শাবানের এই রাতে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে সালাত, যিকির, কোরআন তিলাওয়াত করাও প্রমাণিত হয়।

এজন্যই বহু ইমামগণই এ রাতের নফল ইবাদত করাকে মুস্তাহাব বলেছেন এবং নিজেরাও বেশি বেশি ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। যেমনঃ ইমাম শাফিঈ, ইমাম নববী, ইমাম বাযযার, ইমাম উকায়লী, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সহ আরও অনেকে যার বিবরণ সামনে আরও আসবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব, যারা এ কথা বলে থাকেন যে, শবে বরাতের কোন ভিত্তি নেই, এর ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই, তারা রসূলের (সঃ) হাদীসের নামে মিথ্যাচার করেন এবং উম্মতকে রসূল (সঃ) এর সুন্নত ও নেক আমল থেকে দূরে সরে রাখানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের এই হীন চক্রান্তকে আমরা ধিক্কার জানাই।

মনে রাখবেন, আল্লাহ পাক মিথ্যাবাদীদের উপর লানত দিয়েছেন। আজও তাই পবিত্র কোরআনের এই আয়াতটি দিয়েই শেষ করবঃ

لُعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহর অভিশম্পাত। {সূরা আলে ইমরান-৬১ }

তাই আসুন, আমরা শবে বরাত নিয়ে এখনও যারা ভুলের উপর আছি, তারা শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীস গুলোর সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান নিয়ে এ ফযীলতপূর্ণ রাতটিতে ইবাদতের মাধ্যমে কাটায় এবং আল্লাহর কাছে নিজের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

পর্ব ১১

### হাদীছের আলোকে শবে বরাত - ৩

গত পর্বে আমরা শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত একটি হাদীস উল্লেখ করে সেটি সহীহ প্রমাণ করেছিলাম। যদি শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে দ্বিতীয় কোন হাদীস না থাকত, তবে এই হাদীসটিই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত।

কিন্তু শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে আরও সহীহ বা হাসান হাদীছ বিদ্যমান। এই পর্বে আমরা আরও একটি হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সাথে সাথে এই হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মতামত পর্যালোচনা করব।

### দ্বিতীয় হাদীছ (حسن في درجة الصحيح)

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) থেকে বর্ণিত, হযুর (সঃ) বলেছেনঃ শাবান মাসের পঞ্চদশ রজনীর আগমণ হলে মহান আল্লাহ পৃথিবীর আসমানে তাশরীফ আনেন এবং স্বীয় বান্দাদিগকে মাফ করে দেন। কিন্তু মুশারিক ও অপর ভাইয়ের সাথে হিংসা পোষণকারী ব্যতীত।

উক্ত হাদীসটিঃ

- ১। ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে
- ২। ইমাম উকায়লী তাঁর যয়ীফা আল কাবীর
- ৩। বাযযার তাঁর মুসনাদে
- ৪। ইমাম মুনযিরী তাঁর তারগীব ওয়াত তারহীব
- ৫। ইমাম হাইছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদে
- ৬। ইবনে খোযাইমা তাঁর তাওহীদে

সংকলন করেছেন।

### হাদীছটি সম্পর্কে হাদীস শাস্ত্রবিদগণের অভিমতঃ

#### প্রথম অভিমতঃ

হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনযিরী (মৃঃ ৬৫৭ হিঃ) বলেনঃ বাযযার ও বাইহাকী এই হাদীছটিকে **لا بأس** (সনদে কোন সমস্যা নেই) সনদের সাথে বর্ণনা করেছেন।

( তারগীব ওয়াত তারহীবঃ খ-৪ , পৃ-২৩৮ )



উল্লেখ্য মুহাদ্দিছগণ কোনো হাদীছের ক্ষেত্রে لا بأس বলার অর্থ হাদীছটি শক্তিশালী হওয়ার প্রতি নির্দেশকা

### দ্বিতীয় অভিমতঃ

হাফিয় আল-হাইছামী বলেনঃ হাদীছটি বাযযার বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে আব্দুল মালিক ইবনে আবদিল মালিক নামক একজন রাবী (বর্ণনাকারী) আছে। ইবনু আবি হাতিম যাকে جرح و تعدیل জরাহ ওয়াত তাদীল (দোষ-ত্রুটি পর্যালোচনা) এ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাকে য' ঈফ তথা দুর্বল আখ্যা দেন নি। তাছাড়া অবশিষ্ট অন্যান্য রাবী ছিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য।

( মাজমাউয যাওয়ায়েদ )

বলা বাহুল্য, ইবনু আবি হাতিম যদি কোন রাবী এর দোষ-ত্রুটি পর্যালোচনার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেন, তখন তার অর্থ হচ্ছে, রাবী নির্ভরযোগ্য। তাই এই দৃষ্টিকোণে উক্তহাদীছটির সকল রাবী ছিকাহ বা নির্ভরযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে علوم الحديث এ قواعده فی علم الحديث আল্লামা যফর আহমদ ওছমানী (রহঃ) বলেনঃ

“ তাঁর অবদান এই যে, ইবনু আবি হাতিম কোনো রাবী এর দোষ-ত্রুটি পর্যালোচনা করার ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকার অর্থ দাঁড়ায় ওই রাবী ছিকাহ ও নির্ভরযোগ্য ঠিক ইমাম বুখারী (রহঃ) এর নীরবতা অবলম্বন করার মতো। ”

( ক্বাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীছঃ পৃ-৩৫৮ )

### তৃতীয় অভিমতঃ

হাফিয় ইবনু আদী আল জুরজানী (মঃ ৩৬৫) বলেনঃ আমি ইবনু হাম্মাদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেনঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, আব্দুল মালিক ইবনু আবদিল মালিক মুস আব ইবনু আবি যিব থেকে আর তার (আব্দুল মালিক ইবনু আবদিল মালিক) থেকে আমার ইবনু হারিস এর বর্ণনা করার বিষয়টি বিবেচনার বিষয় (অতঃপর হাফিয় ইবনু হাদী আল জুরজানী বলেন) আবদুল মালিক ইবনু আবদিল মালিক হাদীছটির সাথে মারুফ। আ' মর বিন হারিস ব্যতীত উক্ত হাদীছটি আবদুল মালিক থেকে আর কেউই বর্ণনা করে নি আর হাদীছটি এই সনদের সাথে মুনকার।

### উক্ত অভিমতের পর্যালোচনাঃ

১। ইমাম বুখারী (রহঃ) আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত এই হাদীছটির ব্যাপারে যে বলেছেন وفيه نظر তথা তার মধ্যে বিবেচনার বিষয় রয়েছে - এর দ্বারা মূল হাদীছটি সহীহ প্রমাণ হওয়ার ব্যাপারে কোন সমস্যা সৃষ্টি হয় না।

উল্লেখ্য যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) এ হাদীছের সূত্রকে وفيه نظر বলার মূল কারণ হলো “ عبد الملك بن عبد الملك ” নামক রাবী তাঁর দৃষ্টিতে দুর্বল হওয়ার দরুণ, অন্যথায় এ হাদীছের সূত্রের অন্য কোন রাবীর ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি নেই।

আর উপরোক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হলো যে, عبد الملك بن عبد الملك সম্পর্কে ইমাম আবু হাকিম দুর্বল – এ জাতীয় কোন মন্তব্য করেন নি।

الحديث علوم الحديث এর বিবরণে বুঝা গেল যে ইবনে আবি হাতিম কোন রাবীর ব্যাপারে সমালোচনা থেকে নিশ্চুপ থাকার অর্থই হলো রাবীটি নির্ভরযোগ্য و ثقة। সুতরাং ইবনে আবি হাতিমের মতানুসারে এ হাদীছটির সূত্রের মধ্যে কোন দুর্বলতা নেই। তাই ইমাম বুখারীর মন্তব্য এখানে অগ্রহণযোগ্য।

( বিস্তারিত জানতে জরাহ ওয়াত তাদীলের কিতাব সমূহ দেখতে পারেন )

২। তদুপরী যেহেতু হাদীছটির সমর্থনে আরো অনেক হাদীছ পাওয়া যায় বিধায়, যেমনঃ

- ক) মুআ' য ইবনে জাবাল (রঃ)
- খ) আবু ছা' লাবাহ (রঃ)
- গ) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রঃ)
- ঘ) আবু মূসা আশআরী (রঃ)
- ঙ) আবু হুরায়রা (রঃ)
- চ) হযরত আয়েশা (রঃ)।

প্রমুখ সাহাবীদের এর সমর্থনে হাদীছ পাওয়া যায়।

হাদীছটি অতএব উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী অন্য হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে শক্তিশালী হয়ে উঠে। অতএব যঈফ বলার অবকাশ নেই।

৩। তেমনভাবে ইবনু হাদী হাদীছটিকে মুনকার আখ্যা দেয়ার দ্বারা হাদীছটি যঈফ হয়ে যায় না। কারণ পূর্ববর্তী মুহাদ্দিগণের মতে একক রাবী (فرد راوی) এর কারণে হাসান এবং সহীহ হাদীছকেও মুনকার আখ্যা দেয়া যায়। আর ইবনু আদী প্রমুখ পূর্ববর্তী মুহাদ্দিগণের দলভুক্ত। তাই তিনি নিছক একক রাবী পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতেই হাদীছটি মুনকার বলে দিয়েছেন। সুতরাং ইবনে আ' দীর উক্তি যে মুনকার বলা হয়েছে তা মূলত মুনকার দুর্বল হাদীছের অন্তর্ভুক্ত নয়।

যেমনঃ الرفع والتكميل في الجرح والتعديل

“ কোন রাবী এর রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে কামিল এবং মীযান প্রভৃতিতে মুনকার শব্দ পাওয়া গেলেই তাকে তাড়াছড়া করে যঈফ বলে রায় দিয়ে ফেলো না। কারণ তারা হাসান এবং সহীহ হাদীছেও শুধুমাত্র একক রাবী পেলেই যঈফ হিসেবে রায় দিয়ে ফেলেন। আর মুতাকাদ্দিমীন তথা পূর্ববর্তীগণের এবং মুতাআখখিরীন তথা পরবর্তীগণের وهذا حديث منكر (এটি মুনকার হাদীছ) বলার মাঝে পার্থক্য করা উচিত। কারণ পূর্ববর্তীগণ অধিকাংশ সময় কেবলমাত্র একক রাবী পেলেই মুনকার এর রায় দিয়ে দেন। যদিও হাদীছটি ছিকাহ রাবী থেকে বর্ণিত। পক্ষান্তরে পরবর্তীগণ মুনকার এর রায় এমন দুর্বল রেওয়ায়েতের ক্ষেত্রে প্রদান করেন যে রেওয়ায়েত ছিকাহ রাবী এর রেওয়ায়েতের সাথে সাংঘর্ষিক। ”

( উল্লেখ্য, যারা ইবনু হাদীর মতানুসারে হাদীসটিকে যঈফ বলে থাকেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, শুধুমাত্র একক রাবীর জন্যই যদি হাদীসকে যঈফ বলা হয়, তাহলে তো সিহাহ সিভাহ থেকে শুরু করে অনেক হাদীসগ্রন্থের অনেক সহীহ ও হাসান হাদীসও আপনাদের দৃষ্টিতে দুর্বল হয়ে যাবে। মূলত মুনকার বলার ক্ষেত্রে পূর্ব যুগের মুহাদ্দিগণের রায় আর পরবর্তী মুহাদ্দিগণের রায়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। তাই উসূলে হাদীসের নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে তার পর মন্তব্য করা উচিত। )

চতুর্থ অভিমতঃ

ইমাম উকায়লী (রহঃ) আলোচ্য হাদীছটিকে তার الضعفاء الكبير গ্রন্থের বিবরণ তুলে ধরে মন্তব্য করেন যে,

পঞ্চদশ শা' বান রজনীতে আল্লাহতাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন মর্মে যেসব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে **لین** তথা কিছু কমজুরী রয়েছে। তবে প্রত্যেক রাতে আল্লাহ তাআলার অবতরণের কথা বহু সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই মধ্য শাবানের রজনীতেও মহান আল্লাহর অবতরণের বিষয়টি এসব সহীহ হাদীছেরই অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত।

(যয়ীফা আল কাবীরঃ খ-১, পৃ-২৯)

সুতরাং নুযুলে রবের হাদীছ দ্বারা হাদীছে আবী বকরের পূর্ণ সমর্থন পাওয়ায় হাদীছটি শক্তিশালী হয়ে উঠায় মূল হাদীছকে সহীহ বলতে হবে।

**পঞ্চম অভিমতঃ**

ইমাম তাবরানী (রহঃ) তার স্বীয় (المعجم الكبير) গ্রন্থে হাদীছটিকে উল্লেখ করার পর এ কিতাবের মুহাক্কিক বলেনঃ

এ হাদীছটি বহু সূত্রে বর্ণিত। যারা এ ব্যাপারে অবগত আছে তাদের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে এটি সহীহ বলে সাব্যস্ত। বিশেষ করে যখন এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীছ “حسن لذاته” তথা সহীহ সূত্রে প্রমাণিত। যেমনঃ হযরত মুয়ায (রঃ) ও হযরত আবু বকর (রঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছগুলো।

(মুজামুল কাবীরঃ খ-২০, পৃ-১০৮)

এতে প্রমাণিত হয় যে, শবে বরাত সম্পর্কীয় হাদীছসমূহে হযরত মুয়ায ও আবু বকর থেকে বর্ণিত হাদীছগুলো সূত্রের দিক দিয়ে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে সহীহ বলে সাব্যস্ত।

**সার কথাঃ**

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীছটি সহীহের অন্তর্ভুক্ত।

হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনযিরী

ইমাম তাবরানী

ইমাম উকায়লী

হাফিয আল-হাইছামী

প্রমুখ বড় বড় মুহাদ্দিসগণ হাদীসটির সহীহ হওয়াতে সত্যয়ন করেছেন।

**আহলে হাদীস/সালাফী ভাইদের কাছে প্রশ্ন ও দাওয়াতঃ**

প্রথমত, উপরে বর্ণিত হাদীসটির সনদ নিজে থেকেই হাসান বা সহীহ পর্যায়ে।

দ্বিতীয়ত, হাদীসটির সমর্থনে আরও অনেক হাদীস থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এই হাদীসটি সহীহের পর্যায়ে চলে আসে।

অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসরাই এই হাদীসের তাহকীক করেছেন এবং একে সহীহ বলেছেন।

অন্যদিকে হাদীসের তাহকীক তথা বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সালাফী/আহলে হাদীছ ভাইরাযার সবচেয়ে বেশি

ভক্ত, যার কিতবাদি অনুবাদ করে আপনারা প্রচার করে থাকেন, সময়কালের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ নাসিরউদ্দীন আলবানীও (রহঃ) শবে বরাতে হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রঃ) এর হাদীসকে সহীহ প্রমাণের সময় উপরোক্ত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ) এর হাদীসটি নিয়ে এসে আলোচনা করেন। এবং সবার শেষে সব হাদীসের সমর্থনে সহীহ বলে রায় প্রদান করেন।

( সিলসিলাতুস সাহিহাহর ৩ নং খন্ডের ১৩৫ নং পৃষ্ঠা )

তাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তাহলে কেন আপনারা বার বার বলেন যে, শবে বরাতে ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই??

উপরন্তু আপনাদের জ্ঞাতার্থে আরও বলছি, আপনাদের সবচেয়ে বড় গণ্যমান্য ইমাম, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ)ও শবে বরাতে ফযীলত সংক্রান্ত হাদীস গুলোকে তাহকীক করেছেন এবং এর ফযীলতকে স্বীকার করেছেন। তিনি এই রাতে একাকী নফল নামায পড়ার পক্ষে একদল সালাফও ছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে আমার গত পর্ব দেখে আসতে পারেন।

এখন সালাফী বা আহলের হাদীসের ঐসব বন্ধুদের প্রতি দাওয়াত রইল, আপনারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), শায়খ আলবানী (রহঃ) এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরজ করতে চাই যে, আপনারা যদি শায়খ ইবনে বাযের (রহঃ) অনুসরণে বা নিজেদের তাহকীক মতো এই রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে পারেন তাহলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযীলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সব ধরনের বেদআত রসম-রেওয়াজ পরিহার করে নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন তারাই এমন কি অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা ভুলের সম্ভাবনার উর্ধ্বে নয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং বাতিলপন্থিদের মিশন সফল করতে সহায়তা দেওয়া কি সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি প্রয়োজন? এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আপনারা আপনাদের মতটিকে খুব বেশি হলে একটি ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনায়ুক্তই মনে করেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতটিকে একেবারে ওহীর মতো মনে করেন না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা আর থাকে কি না?

আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) [মৃ. ৭২৮ হিঃ] এর ইক্তিয়াউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (রহঃ) [মৃ. ৭৯৫] এর লাতায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায (রহঃ) এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? যা হয়ত তিনি শবে বরাত নিয়ে জাহেল লোকদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, বাড়াবাড়ির প্রতিকার কোন বাস্তব সত্য অস্বীকার করে নয়, বরং সত্য বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

**শেষ কথাঃ**

যদি অন্যান্য রাতের উপর এ রাতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই থাকবে, তবে বিশেষভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করারই বা কি প্রয়োজন? শুধু এই রাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমেই অন্যান্য রাতের উপর এর বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

উপরের হাদীস থেকে স্পষ্টতই এটা প্রমাণিত হয় যে, এ রাতে আল্লাহ পাক তাঁর বিপুল সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করেন। যে রাতে আল্লাহ বিশেষভাবে ক্ষমার ওয়াদা করেছেন, সেই রাতে কাকুতি মিনতি করে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এটাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া, তওবা করা বা যে কোন দোয়া করার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কোন ভাল আমলের মাধ্যমে দোয়াটিকে শক্ত করা যাতে দ্রুত কবুল হয়। বুখারী শরীফের তিন জন যুবকের কাহিনী হতে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যারা পাহাড়ের গুহাতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। পরে একজনের পরামর্শে প্রত্যেকের ভাল আমল উল্লেখ করে দোয়া করলে আল্লাহ তাদের মুক্ত করেন। তাছাড়া অনেক হাদীসেই নফল নামায পড়ে দোয়া করা, কোরআন তিলাওয়াত করে দোয়া করা, জিকির আযকার করে দোয়া করা ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে সুতরাং মধ্য শাবানের এই রাতে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে সালাত যিকির, কোরআন তিলাওয়াত করাও প্রমাণিত হয়। এরপরও যদি কেউ বলে থাকেন যে, এই রাতে কোন ইবাদত করা যাবে না, তাহলে তা তার নিজের মনগড়া কথা বা প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

এজন্যই বহু ইমামগণই এ রাতের নফল ইবাদত করাকে মুস্তাহাব বলেছেন এবং নিজেরাও বেশি বেশি ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। যেমনঃ ইমাম শাফিঈ, ইমাম নববী, ইমাম বাযযার, ইমাম উকায়লী, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সহ আরও অনেকে যার বিবরণ সামনে আরও আসবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব, যারা এ কথা বলে থাকেন যে, শবে বরাতের কোন ভিত্তি নেই, এর ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই, তারা রসূলের (সঃ) হাদীসের নামে মিথ্যাচার করেন এবং উম্মতকে রসূল (সঃ) এর সুন্নত ও নেক আমল থেকে দূরে সরে রাখানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের এই হীন চক্রান্তকে আমরা ধিক্কার জানাই।

এরকম একটি ফযীলতপূর্ণ রাত পেয়েও যে ইবাদতে কাটাতে পারল না, সে চরম দুর্ভাগা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেনঃ

আমি জীবন ও ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

এই আয়াত থেকেই বুঝা যায়, আমাদের বেশি বেশি ইবাদত করা প্রয়োজন। উপরন্তু যদি ফযীলতপূর্ণ রাত পাওয়া যায়, তাহলে বেশি বেশি ফযীলত পাওয়ার জন্য ঐ রাতে বেশি বেশি ইবাদত করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পর্ব ১২

## হাদীছের আলোকে শবে বরাত - ৪

গত দুই পর্বে আমরা শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত দুইটি হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোকে সহীহ প্রমাণ করেছিলাম। যদি শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে আর কোন হাদীস না থাকত, তবে এই দুটি হাদীসই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত।

কিন্তু শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে আরও সহীহ বা হাসান হাদীছ বিদ্যমান। এই পর্বে আমরা আরও একটি হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সাথে সাথে এই হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মতামত পর্যালোচনা করব।

## তৃতীয় হাদীছ (حسن)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রঃ) থেকে বর্ণিত রসূল (সঃ) বলেছেন, শা' বানের পনের তারিখ রাতে মহান আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টিজীবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং নিজ বান্দাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তবে দু' জন ব্যতীত।



হিংসুক এবং অন্যায়ভাবে হত্যাকারী।

উক্ত হাদীসটিঃ

- ১। ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে
- ২। ইমাম মুনযিরী তাঁর তারগীব ওয়াত তারহীব
- ৩। ইমাম হাইছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদ
- ৪। শায়খ আলবানী তাঁর সিলসিলাতুল আহাদিসাস সহীহা সংকলন করেছেন।

এ হাদীছ সম্পর্কে হাদীছ বিশারদগণের উক্তিঃ

প্রথম উক্তিঃ

আল মুনযিরী হাদীছটিকে আততারগীব ওয়াত-তারহীব গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেছেনঃ হাদীছটি ইমাম আহমদ (রহঃ) লায়্যিন (শিখীল) সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

( আত তারগীব ওয়াত তারহীবঃ খ-৪ , পৃ-২৩৯ )

দ্বিতীয় উক্তিঃ

আল হাইসামী বলেনঃ হাদীছটি ইমাম আহমদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। তার সনদে ইবনু লাহীআহ নামক জনৈক রাবী রয়েছেন, হাদীছে তার নির্ভরযোগ্যতা দুর্বল। এছাড়া উক্ত হাদীছের অবশিষ্ট রাবীগণ নির্ভরযোগ্য।

( মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ খ-৮ , পৃ-৬৫ )

হাফিয আল হাইসামী এর এই উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, উক্ত হাদীছের সনদে ইবনু লাহীআহ ব্যতীত অন্যান্য সকল রাবী ছিরাহ তথা নির্ভরযোগ্য। শুধু মাত্র ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ প্রশ্ন তুলেছেন।

কে ইবনু লাহীআহ, নিম্নে তার পরিচয় এবং মুহাদ্দিছদের দৃষ্টিতে হাদীছ শাস্ত্রে তার অবস্থানও আলোকপাত করা হলোঃ

ইবনু লাহীআহ সম্পর্কে হাদীছ পর্যালোচকদের মন্তব্যঃ

আব্দুল্লাহ ইবনু লাহীআহ ইবনে আকবাহ ইবনু ফাআন ইবনু সাওবান আল হায়রামী হাদীছ শাস্ত্রের একজন রাবী।

১। ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম ও ইমাম নাসাঈ প্রমুখও তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

( অতএব, যারা ইবনু লাহীআহকে দুর্বল মনে করে এই হাদীসকে দুর্বল বলে রায় দেন, তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের মতানুসারে তাহলে তো সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে ইবনু লাহীআহ কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসও দুর্বল হয়ে যাবে। কিন্তু আপনাদের কাউকেই তো কখনো বুখারী শরীফের কোন হাদীসকে দুর্বল বলতে শুনি নি !! )



২। ইবনু সালাহ বলেনঃ ইবনু লাহীআহ বাহান্তর জন তাবিঈর সাক্ষাত লাভ করেছেন

( দেখুনঃ ইবনু হাজার, তাহযীবুত তাহযীবঃ ৫ম খঃ পৃঃ ৩২৭-৩২৮ )

৩। কোন কোন কউরপন্থী হাদীছ বিশারদ যেমনঃ ইবনু মঈন, আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখের মতে ইবনু লাহীআহ একজন দুর্বল রাবী। যথা এ সুবাদে ইবনু মঈন এর বক্তব্য হচ্ছেঃ

“ ইবনু লাহীআহ একজন যঈফ রাবী। তাঁর হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না। ”

( দেখুনঃ সিয়রু আলামিন নুবালাঃ খ-৮ , পৃ-২১ ; তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-৫ , পৃ-৩৩১ ; মীযানুল ইতিদালঃ খ-২ , পৃ-৪৭৫ )

৪। আর আলী ইবনুল মাদীনী তাঁর সম্পর্কে বলেছেনঃ

“ আমাকে বিশর ইবনুস সিররী বলেছেনঃ যদি তুমি ইবনু লাহীআহকে দেখতে তাহলে তার প্রতীকশীলতা প্রদর্শন করতে না। ”

( দেখুনঃ তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-৫ , পৃ-৩৩১ ; মীযানুল ইতিদালঃ খ-২ , পৃ-৪৭৬ )

৫। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস ইবনু লাহীআহকে ছিকাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

যেমনঃ ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেনঃ

“ অধিক হাদীছ বর্ণনা, সংরক্ষণ এবং নিখুঁত হাদীছের ক্ষেত্রে মিশরে ইবনু লাহীআহ এর সমকক্ষ আর কে হতে পারে? ”

( সিয়রু আলামিন নুবালাঃ খ-৮ , পৃ-১৩ ; মীযানুল ইতিদালঃ খ-২ , পৃ-৪৭৭ ; তায়কিরাতুল হুফফাজঃ খ-১ , পৃ-২৩৮ )

৬। ইমাম ছওরী (রহঃ) বলেনঃ

“ ইবনু লাহীআহ এর কাছে রয়েছে হাদীছশাস্ত্রের মূলনীতি আর আমাদের কাছে রয়েছে শাখা-প্রশাখা । ”

( তায়কিরাতুল হুফফাজঃ খ-১ , পৃ-২৩৯ ; তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-৫ , পৃ-৩২৬ ; সিয়রু আলামিন নুবালাঃ খ-৮ , পৃ-১৩ )

৭। ইবনু ওহাব বলেনঃ

“ আল্লাহর কসম, আমাকে সৎ ও সত্যবাদী আব্দুল্লাহ ইবনু লাহীআহ হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ”

( মীযানুল ইতিদালঃ খ-২ , পৃ-৪৭৭ ; তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-৫ , পৃ-৩২৬ )

৮। আহমদ ইবনু সালাহ বলেনঃ

“ ইবনু লাহীআহ ছিকাহ। তাঁর বর্ণিত যেসব হাদীছে মিশ্রণ রয়েছে সেই মিশ্রণকে প্রত্যাখান করা হবে। ”

( তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-৫ , পৃ-৩৩১ )

সারকথাঃ

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন কোন কউরপন্থী মুহাদ্দিছ ইবনু লাহীআহকে দুর্বল আখ্যায়িত করলেও কিন্তু তাঁর দুর্বলতা এই পর্যায়ে নয় যে, তাঁর বর্ণিত হাদীছ একেবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরন্তু বহু মুহাদ্দিছ তাঁর হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন এবং তাঁর বর্ণিত হাদীছকে ‘হাসান’ স্তরের বিবেচনা করেছেন।

যেমনঃ হাফিয় হাইসামী (রহঃ) বলেনঃ

“ ... এখানে ইবনু লাহীআহ নামক একজন রাবী রয়েছে। একাধিক মুহাদ্দিছ তাঁর হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। ”

( মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ খ-১ , পৃ-১৬ )

অন্যত্র তিনি লিখেনঃ

“ ... হাদীছটি ইবনু লাহীআহ বর্ণনা করেছেন। তার মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। তবুও তার হাদীছ হাসান। ”

( মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ খ-৮ , পৃ-১০২ )

( উল্লেখ্য এ দুর্বলতা, রাবী দুর্বল হওয়ার জন্য যে দুর্বলতা লাগে তা নয়, বরং যে দুর্বলতা সহীহ হাদীস ও হাসান হাদীসের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে, তা। এজন্যই অধিকাংশ মুহাদ্দিগণ তাঁর হাদীছ গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর বর্ণনাকৃত হাদীসকে হাসান বলেছেন। )

পর্যালোচনাঃ

শবে বরাত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর এর উল্লেখিত হাদীছটির সনদে ইবনু লাহীআহ থাকায় যদিও কোন কোন মুহাদ্দিছ হাদীছটিকে অনির্ভরযোগ্য হাদীছ হিসেবে রায় প্রদান করেছেন। কিন্তু এ রায়টি সঠিক নয়, কারণ হাফিয় হাইসামী এর উল্লেখিত বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইবনু লাহীআহ এর বর্ণনাকৃত হাদীছ হাসান পর্যায়ের। সুতরাং শবে বরাত সম্পর্কীয় উক্ত হাদীছটিও হাসান হিসেবেই বিবেচিত হবে আর এ ধরনের হাদীছ শরীয়তের বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য। অতএব ফাযাইলে আমালের ক্ষেত্রে তো গ্রহণযোগ্য হবেই।

তৃতীয় উক্তিঃ

বর্তমানকালের হাদীছ পর্যালোচক আলেম নাসিরুদ্দীন আলবানীও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর এর উক্ত হাদীছটিকে হাসান হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ

“ হাদীছটি সূত্রের দিক দিয়ে অগ্রহণযোগ্য নয়। (বিশেষ করে অন্য হাদীছের সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়ার কারণে) এবং হাইসামী বলেছেনঃ ইবনু লাহীআহ অগ্রহণযোগ্য। এছাড়া হাদীছটির বাকী রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। আর মুনিযরী বলেছেনঃ তাঁর সনদ অনির্ভরযোগ্য। আর আমি বলি, রশীদ ইবনু সাদ ইবনু হাই হাদীছটিকে সমর্থন করেছেন। ইবনু হাইওয়য়াহ স্বীয় হাদীছে এটিকে পেশ করেছেন। সুতরাং হাদীছটি হাসান। ”

( সিলসিলাতুল আহাদিসাস সহীহাঃ খ-৩ , পৃ-১৩৬ )

### চতুর্থ উক্তিঃ

সময়কালের হাদীছ পর্যালোচক মুহাক্কিক শায়খ যাগলুল বলেনঃ

“ হায়ছামী আলোচ্য হাদীছটিকে মুসনাদে আহমদ হতে বর্ণনা করে বলেন, এর সূত্রে ইবনু লাহীআহ আছেন। যিনি হাদীছের ব্যাপারে দুর্বল। অন্য সকল রাবী নির্ভরযোগ্য এবং শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি হাসান (তথা সহীহ) এবং ইবনু লাহীআহকে হাফেজ আসকালানী সত্যবাদী ও নির্ভরযোগ্য বলেছেন কাজী আল মিসরী বলেন, হাদীছটি ইবনে লাহীআহ এর দুর্বলতার কারণে সহীহের স্তরে পৌঁছেনি বরং সেটি হাসান হিসেবে সাব্যস্ত। ”

( দেখুনঃ শরহে আলফিয়্যাতুল ইরাকীঃ খ-১ , পৃ-২২০ )

### পঞ্চম উক্তিঃ

মুসনাদে আহমদে উল্লেখিত উক্ত হাদীছ সম্পর্কে শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত এভাবে মন্তব্য করেনঃ

“ হাদীছটি অন্যান্য হাদীছের সহযোগিতায় সহীহের স্তরে পৌঁছেছে। সহযোগী হাদীছগুলো প্রত্যেকটি সূত্রের দিক দিয়ে সমস্যা থাকলেও সবগুলোর সমষ্টি হাদীছটিকে সহীহ ও শক্তিশালী করে তুলেছে। ”

( মুসনাদা আহমদঃ খ-১১ , পৃ-২০৭ )

### সার কথাঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছটি হাসানের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসটিকে হাসান হওয়ার ব্যাপারে সত্যায়ন করেছেন। তাই শবে বরাতে ফযীলত সম্পর্কিত এই হাদীসটিকে অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

আহলে হাদীস/সালাফী ভাইদের কাছে প্রশ্ন ও দাওয়াতঃ

প্রথমত, উপরে বর্ণিত হাদীসটির সনদ নিজে থেকেই হাসান পর্যায়ে।

দ্বিতীয়ত, হাদীসটির সমর্থনে আরও অনেক হাদীস থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এই হাদীসটি হাসান বা সহীহের পর্যায়ে চলে আসে।

অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসরাই এই হাদীসের তাহকীক করেছেন এবং একে হাসান বলেছেন।

অন্যদিকে হাদীসের তাহকীক তথা বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সালাফী/আহলে হাদীছ ভাইরা যার সবচেয়ে বেশি ভক্ত, যার কিতবাদি অনুবাদ করে আপনারা প্রচার করে থাকেন, সময়কালের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ নাসিরউদ্দীন আলবানীও (রহঃ) শবে বরাতে এই হাদীসকে হাসান বলেছেন।

আবার তাঁরই শিষ্য বর্তমান যুগের খ্যাতিমান হাদীছ পর্যালোচক শায়খ শুয়াইব আল আরনাউতও এই হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

এমনকি এ হাদীসটিকে আপনাদের সবচেয়ে বড় গণ্যমান্য ইমাম, শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া তদীয় “ইকতিদাউস সিরাতিল মুস্তাকিম লি মুখালাফাতি আসহাবিল জাহীম” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং বর্ণনাকারীগণকে বিশ্বস্ত বলেছেন।

তাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তাহলে কেন আপনারা বার বার বলেন যে, শবে বরাতে ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই??

এখন সালাফী বা আহলের হাদীসের ঐসব বন্ধুদের প্রতি দাওয়াত রইল, আপনারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), শায়খ আলবানী (রহঃ) এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরজ করতে চাই যে, আপনারা যদি শায়খ ইবনে বাযের (রহঃ) অনুসরণে বা নিজেদের তাহকীক মতো এই রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে পারেন তাহলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযীলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সব ধরনের বেদআত রসম-রেওয়াজ পরিহার করে নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন তারা ই এমন কি অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা ভুলের সম্ভাবনার উর্ধ্বে নয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং বাতিলপন্থিদের মিশন সফল করতে সহায়তা দেওয়া কি সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি প্রয়োজন? এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আপনারা আপনাদের মতটিকে খুব বেশি হলে একটি ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনায়ুক্তই মনে করেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতটিকে একেবারে ওহীর মতো মনে করেন না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা আর থাকে কি না?

আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) [মৃ. ৭২৮ হিঃ] এর ইক্তিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (রহঃ) [মৃ. ৭৯৫] এর লাতায়ফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায (রহঃ) এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? যা হয়ত তিনি শবে বরাত নিয়ে জাহেল লোকদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, বাড়াবাড়ির প্রতিকার কোন বাস্তব সত্য অস্বীকার করে নয়, বরং সত্য বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

### শেষ কথাঃ

যদি অন্যান্য রাতের উপর এ রাতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই থাকবে, তবে বিশেষভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করারই বা কি প্রয়োজন? শুধু এই রাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমেই অন্যান্য রাতের উপর এর বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

উপরের হাদীস থেকে স্পষ্টতই এটা প্রমাণিত হয় যে, এ রাতে আল্লাহ পাক তাঁর বিপুল সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করেন। যে রাতে আল্লাহ বিশেষভাবে ক্ষমার ওয়াদা করেছেন, সেই রাতে কাকুতি মিনতি করে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এটাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া, তওবা করা বা যে কোন দোয়া করার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কোন ভাল আমলের মাধ্যমে দোয়াটিকে শক্ত করা যাতে দ্রুত কবুল হয়। বুখারী শরীফের তিন জন যুবকের কাহিনী হতে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যারা পাহাড়ের গুহাতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। পরে একজনের পরামর্শে প্রত্যেকের ভাল আমল উল্লেখ করে দোয়া করলে আল্লাহ তাদের মুক্ত করেন। তাছাড়া অনেক হাদীসেই নফল নামায পড়ে দোয়া করা, কোরআন তিলাওয়াত করে দোয়া করা, জিকির আযকার করে দোয়া করা ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং মধ্য শাবানের এই রাতে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে সালাত যিকির,

কোরআন তিলাওয়াত করাও প্রমাণিত হয়। এরপরও যদি কেউ বলে থাকেন যে, এই রাতে কোন ইবাদত করা যাবে না, তাহলে তা তার নিজের মনগড়া কথা বা প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

এজন্যই বহু ইমামগণই এ রাতের নফল ইবাদত করাকে মুস্তাহাব বলেছেন এবং নিজেরাও বেশি বেশি ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। যেমনঃ ইমাম শাফিঈ, ইমাম নববী, ইমাম বাযযার, ইমাম উকায়লী, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সহ আরও অনেকে যার বিবরণ সামনে আরও আসবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব, যারা এ কথা বলে থাকেন যে, শবে বরাতের কোন ভিত্তি নেই, এর ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই, তারা রসূলের (সঃ) হাদীসের নামে মিথ্যাচার করেন এবং উম্মতকে রসূল (সঃ) এর সুন্নত ও নেক আমল থেকে দূরে সরে রাখানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের এই হীন চক্রান্তকে আমরা ধিক্কার জানাই।

এরকম একটি ফযীলতপূর্ণ রাত পেয়েও যে ইবাদতে কাটাতে পারল না, সে চরম দুর্ভাগা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেনঃ

আমি জীবন ও ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

এই আয়াত থেকেই বুঝা যায়, আমাদের বেশি বেশি ইবাদত করা প্রয়োজন। উপরন্তু যদি ফযীলতপূর্ণ রাত পাওয়া যায়, তাহলে বেশি বেশি ফযীলত পাওয়ার জন্য ঐ রাতে বেশি বেশি ইবাদত করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

## পর্ব ১৩

### হাদীছের আলোকে শবে বরাত - ৫

গত তিন পর্বে আমরা শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত তিনটি হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোকে সহীহ বা হাসান প্রমাণ করেছিলাম। যদি শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে আর কোন হাদীস না থাকত, তবে এই তিনটি হাদীসই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত।

কিন্তু শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে আরও সহীহ বা হাসান হাদীছ বিদ্যমান। এই পর্বে আমরা আরও একটি হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সাথে সাথে এই হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মতামত পর্যালোচনা করব।

### ৪র্থ হাদীছ (حسن صحيح لغيره)

হযরত আয়শা (রঃ) বলেন, এক রাতে আমি হুযুর (সঃ) কে বিছানাতে পেলাম না। তাই তাঁকে খোজ করার উদ্দেশ্যে বের হলাম। তখন দেখতে পেলাম তিনি জান্নাতুন বাকীতে আছেন। আমাকে দেখে তিনি বলে উঠেন, তুমি কি এই আশংকা করছো যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল (সঃ) তোমার সাথে অবিচার করবে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি ধারণা করেছিলাম আপনি অন্য কোন স্ত্রীর ঘরে তাশরীফ নিয়েছেন। হুযুর (সঃ) বললেন, শা' বানের পনের তারিখ রাতে মহান আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে তাশরীফ নেন এবং বনু কালব গোত্রের ভেড়া-বকরির পশমগুলোর চেয়েও অধিক সংখ্যক লোককে তিনি মাফ করে দেন।

উক্ত হাদীসটিঃ

১। ইমাম তিরমিযী তাঁর তিরমিযী শরীফে

২। ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে

- ৩। ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে
- ৪। ইমাম ইবনে আরী শাইবাহ তাঁর মুসান্নাফে
- ৫। ইমাম বগবী তাঁর শরহেস সুন্নাহয়
- ৬। ইবনে আহমদ তাঁর মুসনাদে

সংকলন করেছেন।

**হাদীছটির সনদের অবস্থানঃ**

**প্রথম উক্তিঃ**

**ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীছটির সনদ পর্যালোচনা করতে গিয়ে বলেনঃ**

“ হযরত আয়শা (রঃ) এর হাদীছটি আমরা শুধুমাত্র হাজ্জাজ এর সূত্রে পাই। আর আমি ইমাম বুখারী (রহঃ) কে বলতে শুনেছি যে, তিনি হাদীছটিকে দুর্বল বলেছেন। তিনি আরো বলেছেন যে, ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসীর উরওয়া থেকে হাদীছটি শ্রবণ করেননি। আর হাজ্জাজও ইয়াহইয়া থেকে শ্রবণ করেননি। ”

ইমাম তিরমিযীর এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ইমাম বুখারী (রহঃ) হাদীছটিকে দুর্বল সাব্যস্ত করেছেন। দুর্বল হওয়ার কারণ হচ্ছে যেহেতু হাদীসের সনদে দুই জায়গাতে ইনকিতা (রাবীর সাথে সাক্ষাত না হওয়া বা রেওয়ায়েত শ্রবণ না করা) পাওয়া গেছে। আর তা এভাবে যে, প্রথমত হাজ্জাজ ইবনু আরতাত ইয়াহইয়া ইবনু আবি কাসীর থেকে হাদীছটি শুনেছেন। দ্বিতীয়ত, ইয়াহইয়া নিজে উরওয়াহ থেকে হাদীছটি শ্রবণ করেন নি।

**উক্ত উক্তির পর্যালোচনাঃ**

ইমাম বুখারী (রহঃ) এর উক্ত মতামতের ব্যাপারে আমাদের সবিনয় বক্তব্য হলো, হাজ্জাজ যে ইয়াহইয়া থেকে শ্রবণ লাভ করেননি এই ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কেরামের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই, তবে ইয়াহইয়া যে উরওয়া থেকে শ্রবণ লাভ করেননি, এটা সর্বজনস্বীকৃত কথা নয়। কারণ, ইবনু মঈন প্রমুখ প্রমাণ করেছেন যে, উরওয়া থেকে ইয়াহইয়া শ্রবণ লাভ করেছেন।

**যেমনঃ আল্লামা যুরকানী বলেনঃ**

“ হাজ্জাজ ইয়াহইয়া থেকে শ্রবণ না করার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। কিন্তু ইয়াহইয়া উরওয়া থেকে শ্রবণ করার বিষয়টিও আবু যুরআহ ও আবু হাতিম প্রত্যাখান করেছেন। আর ইবনু মঈন তা প্রমাণ করেছেন। প্রত্যাখানের চেয়ে প্রমাণই অগ্রগণ্য। ”

( মারিফুস সুনান, আল্লামা মুহাদ্দিস শায়খ ইউসুফ বিননুরীঃ খ-৫ , পৃ-৪২০ )

( আমরা যখন কোন কিছু প্রমাণ পাই না, তখন তাকে ঠিক মনে করি না; কিন্তু এরপর যখন প্রমাণ পাই, তখন তা সঠিক বলে রায় দিই। এখানেও একই ঘটনা ঘটেছে, আবু যুরআহ ও আবু হাতিম প্রমাণ পান নি বলে তা গ্রহণ করেন নি; কিন্তু ইবনু মঈন প্রমাণ পেয়েছেন তাই গ্রহণ করেছেন। তাই যেহেতু আমাদের কাছে এখন প্রমাণ আছে, অতএব আমাদেরকে প্রমাণটিই গ্রহণ করতে হবে। )

অতএব উক্ত ব্যখ্যার আলোকে ইনকিতা কেবল এক জায়গাতে থাকে। পরন্তু হানাফী মাযহাবের মুহাদ্দিছীনের মতে এ ধরনের ইনকিতা মূল হাদীছ প্রমাণ করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। যেহেতু তার অন্য রাবীগণতো ছিকাহ অন্য হাদীছের মাধ্যমে তার সমর্থনও বিদ্যমান। এই কারণেই ইবনু হিব্বান



তার সহীহ নামক গ্রন্থে হযরত আয়শা (রঃ) এর এই হাদীছটি হাসান বলে আখ্যায়িত করেছেন

যেমনঃ শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়াতে এসেছেঃ

“ শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীছ এসেছে। অধিকাংশরা সেগুলোকে যঈফ বিবেচনা করছেন। ইবনু হিব্বান কয়েকটিকে সহীহ বলেছেন। কিছু হাদীছকে উদারতা প্রদর্শন পূর্বক সহীহ বলেছেন। আর কিছু হাদীছ হাসান হলেও সহীহ বলে দিয়েছেন এবং নিজ সহীহ নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। কেননা উভয়টি দ্বারা (সহীহ ও হাসান) দলীল পেশ করা যায়। হযরত আয়শা (রঃ) এর বর্ণিত উক্ত হাদীছটিও এ ধরনেরই ”

( শরহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়াতঃ খ-৭ , পৃ-৪৪১ )

এমনকি হযরত আয়শা (রঃ) এর এই হাদীছটি ইমাম তিরমিযী ছাড়াও

ক) ইমাম ইবনু মাযাহ তাঁর সুনান-এ

খ) ইমাম ইবনু আবি শাইবাহ তাঁর মুসান্নফ-এ

গ) ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ এ

ঘ) ইমাম বায়হাকী শুআবুল ঈমান ও ফাযাইলে আওকাত অধ্যায়-এ

এবং

ঙ) ইমাম বগভী তাঁর শরহুস সুন্নাহ এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

কিন্তু এসব বড় বড় মুহাদ্দিছের মধ্য থেকে কেউই হাদীছটি জাল বলেন নি কিংবা অত্যাধিক দুর্বলও বলেননি বরং হাদীছটির সনদের সমস্ত রাবী ছিরাহ এবং অন্য আরো হাদীছের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় হাদীছটি শক্তিশালী হয়ে যায়। সুতরাং নিঃসন্দেহে হাদীছটি হাসান এবং সহীহ লিগাইরিহী এর স্তরের।

দ্বিতীয় উক্তিঃ

মুসনাদে আহমদের মুহাক্কিক বিশিষ্ট হাদীছ পর্যালোচক হামযা আহমদ আয যায্যান উক্ত হাদীছ সম্পর্কে পরিষ্কার মন্তব্য করেছেন اسنادہ حسن হাদীছের সূত্র হাসানের স্তরের।

( দেখুনঃ মুসনাদে আহমদের টীকা )

তৃতীয় উক্তিঃ

ইমাম বায়হাকী (রঃ) উক্ত হাদীছটি সংকলন করার পর বলেনঃ

“ এ হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে হযরত আয়শা, আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত আবু মূসা আশআরী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছসমূহ। সুতরাং আলোচ্য হাদীছটি এসকল হাদীছের সমর্থনে সহীহ বলে সাব্যস্ত তাই শাযখ হামজা আহমদ আযযায্যান হাদীছটিকে اسنادہ حسن বলে মন্তব্য করেছেন। ”

সার কথাঃ

হযরত আয়শা (রঃ) এর উপরোক্ত হাদীসটিতে এক জায়গায় ইনতিক্বা পাওয়া যায় আর অনেক বড় বড় ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে বিশেষ করে হানাফী মাযহাবের মুহাদ্দিসীদের কাছে এ ধরনের ইনতিক্বা মূল হাদীস

প্রমাণের ক্ষেত্রে অন্তরায় নয় যদি হাদীসের অন্য রাবীগণ ছিঁকাহ হন।  
শায়খ আলবানী (রহঃ) নিজেও এই হাদীসের সমস্ত রাবীকে বিশ্বস্ত বলেছেন।

( সিলসিলাতুস আহাদিসা সহীহা )

অতএব, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ইমাম সুয়ুতী তদীয় ‘ জামিউস সগীর’ গ্রন্থে হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

দ্বিতীয়ত, এ হাদীসের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং এর সমর্থনে অনেক হাদীস পাওয়া যায় যেমনঃ আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ) এর সহীহ হাদীছ হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রঃ) এর সহীহ হাদীস হযরত আবু মুসা আশআরী (রঃ) এর হাসান হাদীছ। এমনকি খোদ হযরত আয়েশা (রঃ) থেকেই বিভিন্ন সূত্রে হাদীছের বিভিন্ন কিতাবেই এই হাদীছটি বর্ণিত আছে। তাই সবকিছু একত্রে করে এ কথা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হাদীসটি হাসান পর্যায়ের।

ইমাম বায়হাকী  
আল্লামা যুরকানী  
ইমাম সুয়ুতী  
ইমাম ইবনু হিব্বান  
শায়খ হামযা আহমদ আয যায়্যান

প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ হাদীছটির হাসান হওয়াতে সত্যায়ন করেছেন।

তৃতীয়ত, এরপরও যদি কেউ হাদীসটিকে দুর্বল আখ্যায়িত করতে চান, তবুও এই হাদীছটি গ্রহণ করা যাবে। কারণ ফাজায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীছ গ্রহণ করা যায়, এতে ইমামগণের ইজমা আছে। উসূলে হাদীছের নীতিমালা সম্পর্কে জানতে চাইলে আমার দেওয়া ৮ম পর্বটি দেখে আসুন।

### পঞ্চম হাদীছ(حسن)

হযরত আবু মুসা আল আশআরী (রঃ) রসূলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ অবশ্যই আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের পনের তারিখ রাতের বেলায় (সৃষ্টিজীবের) প্রতি মনোযোগ প্রদান করেন। তারপর মুশরিক এবং হিংসুক ব্যতীত সকল মাখলুককে মাগফিরাত ফরমান।

উক্ত হাদীসটিঃ

- ১। ইমাম ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে
- ২। ইমাম বায়হাকী তাঁর ফায়য়িলুল আওকাতে
- ৩। ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে
- ৪। বাযযার তাঁর মুসনাদে
- ৫। ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে
- ৬। ইমাম হাইছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদে
- ৭। ইবনে হিব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে
- ৮। ইমাম তাবরানী তাঁর কাবীরে

সংকলন করেছেন।

### উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে পর্যালোচনাঃ

১। উক্ত হাদীছ ইমাম ইবনু মাজাহ রাশিদ ইবনু সাঈদ ইবনু রাশিদ আররামালী থেকে বর্ণনা করেছেন।

যাঁর সম্পর্কে হাফিয় ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেনঃ

“ দশম স্তরের একজন সত্যবাদী রাবী। ”

( তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-৩ , পৃ-১৯৬ )

২। ওলীদ ইবনু মুসলিম আল কারশী।

যাঁর সম্পর্কে ইবনু হাজার বলেনঃ

“ তিনি একজন ছিকাহ রাবী। মুদাল্লাস রেওয়ায়েত অধিক করেছেন। ”

( তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-২ , পৃ-২৮৯ ; খ-১১ , পৃ-১৩৪ )

ইবনু সাআদ তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ

“ ওলীদ একজন নির্ভরযোগ্য অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন। ”

( তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-১১ , পৃ-১৩৪ )

৩। ابن لهيعة ইবনু লাহীআহ।

যার সম্পর্কে হাফিয় হাইসামী এর বরাতে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর হাদীছ হাসান।

৪। ضحاک بن الایمن যাহহাক ইবনু আইমান।

হাফিয় ইবনু হাজার এবং হাফেজ জাহাবী বলেন তিনি মাজহুল অর্থাৎ অজ্ঞাত।

( তাহযীবুত তাহযীবঃ মীযানুল ইতিদাল )

৫। যাহহাক ইবনু আবদির রাহমান আরযাব।

হাফিয় ইবনু হাজার, হাফিয় আজালী বলেন, তিনি নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী। ( তাহজীবুত তাহজীব )

৬। আবু মূসা আল আশআরী (রঃ) তিনি একজন জলীলুল রুদর সাহাবী।

### হাদীছটির অবস্থানঃ

উল্লেখিত পর্যালোচনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই হাদীছের সনদে শুধু মাত্র একজন রাবী অর্থাৎ জাহহাক ইবনু আইমান মাজহুল তথা অপরিচিত। এছাড়া অবশিষ্ট সকল রাবী নির্ভরযোগ্য আর ইবনু লাহীআর হাদীছ

হাসান স্তরের। (এ ক্ষেত্রে) শুধুমাত্র একজন রাবী এর পরিচয় জানা না থাকলে মূল হাদীছ প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনরূপ অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে না। কারণ এই হাদীছের অনুকূলে ও সমর্থনে আরও হাদীছ তো অবশ্যই পাওয়া যায়। আর আমরা শুরুতে একথা বলে আসছিলাম যে, যঈফ রেওয়ায়েত যদি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়, তাহলে ‘হাসান’ স্তরে উন্নীত হয়।

এ জন্যই সমকালীন হাদীছ পর্যালোচক আল্লামা নাসির উদ্দীন আলবানী আবু মূসা আশআরী (রঃ) এর হাদীছকে صحيح سنن ابن ماجه গ্রন্থে হাসান হিসেবে প্রমাণিত করেছেন।

( দেখুনঃ সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহ, আলবানীঃ খ- ১ , পৃ- ২৩৩ )

সার কথাঃ

হযরত আবু মূসা আশআরী (রঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটিতে একজন অজ্ঞাত রাবী আছেন। কিন্তু যেহেতু এই হাদীছের সমর্থনে হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রঃ), হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রঃ) এর শক্তিশালী সহীহ হাদীস বর্ণিত আছে, তাই উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী হাদীসটি দুর্বল হবে না, হাসান হয়ে যাবে।

এজন্যই আহলে হাদীছ বা সালাফীদের অন্যতম গণ্যমান্য ব্যক্তি আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) হাদীসটিকে হাসান বলেছেন এবং তাঁর সহীহ সুনানে ইবনে মাজাহতে উল্লেখ করে প্রমাণও করেছেন।

ষষ্ঠ হাদীস(حديث ضعيف صحيح بشواهده)

হযরত আবু ছা' লাবাহ আল খুশানী (রঃ) থেকে বর্ণিত রসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা শাবান মাসের পনের তারিখ রাতে স্বীয় বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন। অতঃপর মুমিনগণকে ক্ষমা করেন, কাফিরদেরকে সুযোগ দেন। আর বিদেষ পোষণকারীদেরকে তাদের বিদেষ পরিত্যাগ করা পর্যন্ত অবকাশ দেন।

উক্ত হাদীসটিঃ

- ১। ইমাম বায়হাকী তাঁর শূয়াবুল ঈমানে
- ২। ইমাম তাবরানী তাঁর কাবীরে
- ৩। ইমাম হাইছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদে

সংকলন করেছেন।

উক্ত হাদীছের সনদ পর্যালোচনাঃ

প্রথম উক্তিঃ

হাফিয যকী উদ্দীন আল মুনযিরী হাদীছটিকে বর্ণনা করার পর বলেনঃ

“ ইমাম বায়হাকী (রহঃ) বলেছেনঃ এই হাদীছের সনদে মাকহুল এবং আবু ছা' লাবাহ এর মাঝখানে ইরসাল (রাবী এর বিলুপ্তি) রয়েছে। ”

আর আমরা ভূমিকাতে (উসূলে হাদীসের নীতিমালায়, ৮ম পর্ব) উল্লেখ করেছিলাম যে, হানাফী ও মালেকী মুহাদ্দিহদের মতে মুরসাল হাদীছ সহীহ এবং প্রমাণ পেশ করার যোগ্য।

এ হাদীছের সূত্রে একজন রাবী রয়েছেন, আল আহওয়াজ ইবনু হাকীম।

**দ্বিতীয় উক্তিঃ**

তাঁর ব্যাপারে হাফেজ হায়ছামী মন্তব্য করেন এভাবেঃ

হাফিয হাইছামী বলেনঃ উক্ত হাদীছ তাবরানী বর্ণনা করেছেন। তার সনদে আহওয়াস ইবনু হাকীম নামক একজন রাবী আছেন। তিনি দুর্বল।

( মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ খ-৮ , পৃ-৬৫ )

**তৃতীয় উক্তিঃ**

অন্য দিকে তার ব্যাপারে শায়খে বুখারী আলী ইবনু মাদীনী বলেনঃ والاحوص ثقة আহওয়াস নির্ভরযোগ্য।

( তাহযীবুল কামাল )

**চতুর্থ উক্তিঃ**

সর্বাধিক উত্তম মন্তব্য করলেন ইমাম দারাকুতনী (রহঃ)। তিনি বলেনঃ

والاحوص يعتبر اذا حدث عنه ثقة

আহওয়াস হতে যখন নির্ভরযোগ্য রাবী রেওয়ায়েত নিবেন তখন সে হাদীছ গ্রহণযোগ্য হবে

সুতরাং এখানে আহওয়াস থেকে বর্ণনা করেছেন আব্দুর রহমান আল মোহারেবী নামক রাবী যিনি সর্বসম্মতিক্রমে নির্ভরযোগ্য। কাজেই আহওয়াসের কারণে আলোচ্য হাদীছের সূত্রকে দুর্বল বলার কোন অবকাশ নেই। সূত্রের অন্যান্য রাবীগণ ছিঁকাহ। তবে এ সূত্রের মধ্যে মাকহুল রাবী এবং হাদীছ বর্ণনাকারী সাহাবী উভয়ের মাঝে একজন রাবী বিলুপ্ত অর্থাৎ রেওয়াতটি মুরসাল। এছাড়া অন্য কোন সমস্যা এ সূত্রে নেই। এ ধরনের হাদীছের সমর্থনে আরো হাদীছ বিদ্যমান থাকায় হাদীছটি সহীহ বলে বিবেচ্য। নূন্যতম হাদীছটি মুরসাল যা হানাফী ও মালেকী মুহাদ্দিহদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে সাব্যস্ত

**সারকথাঃ**

হাফিয হাইছামী এর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, এই হাদীছের সনদে একজন দুর্বল রাবী আছে, তিনি ছাড়া অন্যান্য রাবীগণ ছিঁকাহ। এই দৃষ্টিকোণে যদিও হাদীছটি দুর্বল। কিন্তু তার সমর্থনে হযরত আবু বকর ছিন্দীক (রঃ), হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রঃ) এর সহীহ হাদীছসহ আরো হাদীছ থাকায় উসূলে হাদীছের নীতিমালা অনুযায়ী হাদীছটি আর দুর্বল থাকে না।

**আহলে হাদীস/সালাফী ভাইদের কাছে প্রশ্ন ও দাওয়াতঃ**

প্রথমত, উপরে বর্ণিত তিনটি হাদীসের প্রথমটির সনদ হাসান পর্যায়ের, আর বাকী দুইটি কিছুটা দুর্বল।

দ্বিতীয়ত, হাদীস গুলোর সমর্থনে আরও অনেক হাদীস থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এই হাদীস গুলো হাসান বা সহীহের পর্যায়ে চলে আসে।

তৃতীয়ত, হাদীসগুলো কিছুটা দুর্বল হলেও ফাজায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীছ গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য। এটি উসূলে হাদীসের অন্যতম একটি নীতিমালা।

অনেক বড় বড় মুহাদ্দিসরাই এই হাদীস গুলোর তাহকীক করেছেন এবং এগুলোকে সামষ্টিকভাবে হাসান বলে রায় দিয়েছেন।

অন্যদিকে হাদীসের তাহকীক তথা বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সালাফী/আহলে হাদীছ ভাইরা যার সবচেয়ে বেশি ভক্ত, যার কিতবাদি অনুবাদ করে আপনারা প্রচার করে থাকেন, সময়কালের বিশিষ্ট মুহাদ্দীছ নাসিরউদ্দীন আলবানীও (রহঃ) উপরে বর্ণিত শবে বরাতে ফযীলত বিষয়ক হাদীসগুলোর একটিকে হাসান বলেছেন।

তাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তাহলে কেন আপনারা বার বার বলেন যে, শবে বরাতে ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বা হাসান হাদীসও বর্ণিত নেই??

এখন সালাফী বা আহলের হাদীসের ঐসব বন্ধুদের প্রতি দাওয়াত রইল, আপনারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), শায়খ আলবানী (রহঃ) এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরজ করতে চাই যে, আপনারা যদি শায়খ ইবনে বাযের (রহঃ) অনুসরণে বা নিজেদের তাহকীক মতো এই রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে পারেন তাহলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযীলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সব ধরনের বেদআত রসম-রেওয়াজ পরিহার করে নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন তারাই এমন কি অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা ভুলের সম্ভাবনার উর্ধ্বে নয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং বাতিলপন্থিদের মিশন সফল করতে সহায়তা দেওয়া কি সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি প্রয়োজন? এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আপনারা আপনাদের মতটিকে খুব বেশি হলে একটি ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনায়ুক্তই মনে করেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতটিকে একেবারে ওহীর মতো মনে করেন না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা আর থাকে কি না?

আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) [মৃ. ৭২৮ হিঃ] এর ইক্তিয়াউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (রহঃ) [মৃ. ৭৯৫] এর লাতায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায (রহঃ) এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? যা হয়ত তিনি শবে বরাত নিয়ে জাহেল লোকদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, বাড়াবাড়ির প্রতিকার কোন বাস্তব সত্য অস্বীকার করে নয়, বরং সত্য বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

**শেষ কথাঃ**

যদি অন্যান্য রাতের উপর এ রাতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই থাকবে, তবে বিশেষভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করারই বা কি প্রয়োজন? শুধু এই রাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমেই অন্যান্য রাতের উপর এর বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

উপরের হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টতই এটা প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রে আল্লাহ পাক তাঁর বিপুল সংখ্যক বান্দাকে



ক্ষমা করেন। যে রাতে আল্লাহ বিশেষভাবে ক্ষমার ওয়াদা করেছেন, সেই রাতে কাকুতি মিনতি করে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এটাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া, তওবা করা বা যে কোন দোয়া করার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কোন ভাল আমলের মাধ্যমে দোয়াটিকে শক্ত করা যাতে দ্রুত কবুল হয়। বুখারী শরীফের তিন জন যুবকের কাহিনী হতে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যারা পাহাড়ের গুহাতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। পরে একজনের পরামর্শে প্রত্যেকের ভাল আমল উল্লেখ করে দোয়া করলে আল্লাহ তাদের মুক্ত করেন। তাছাড়া অনেক হাদীসেই নফল নামায পড়ে দোয়া করা, কোরআন তিলাওয়াত করে দোয়া করা, জিকির আযকার করে দোয়া করা ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে সুতরাং মধ্য শাবানের এই রাতে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে সালাত যিকির, কোরআন তিলাওয়াত করাও প্রমাণিত হয়। এরপরও যদি কেউ বলে থাকেন যে, এই রাতে কোন ইবাদত করা যাবে না, তাহলে তা তার নিজের মনগড়া কথা বা প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

এজন্যই বহু ইমামগণই এ রাতের নফল ইবাদত করাকে মুস্তাহাব বলেছেন এবং নিজেরাও বেশি বেশি ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। যেমনঃ ইমাম শাফিঈ, ইমাম নববী, ইমাম বাযযার, ইমাম উকায়লী, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সহ আরও অনেকে যার বিবরণ সামনে আরও আসবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব, যারা এ কথা বলে থাকেন যে, শবে বরাতের কোন ভিত্তি নেই, এর ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই, তারা রসূলের (সঃ) হাদীসের নামে মিথ্যাচার করেন এবং উম্মাতকে রসূল (সঃ) এর সুন্নত ও নেক আমল থেকে দূরে সরে রাখানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের এই হীন চক্রান্তকে আমরা ধিক্কার জানাই।

এরকম একটি ফযীলতপূর্ণ রাত পেয়েও যে ইবাদতে কাটাতে পারল না, সে চরম দুর্ভাগা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেনঃ

আমি জ্বীন ও ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

এই আয়াত থেকেই বুঝা যায়, আমাদের বেশি বেশি ইবাদত করা প্রয়োজন। উপরন্তু যদি ফযীলতপূর্ণ রাত পাওয়া যায়, তাহলে বেশি বেশি ফযীলত পাওয়ার জন্য ঐ রাতে বেশি বেশি ইবাদত করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

.....

পর্ব ১৪

হাদীছের আলোকে শবে বরাত - ৬

গত চার পর্বে আমরা শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত মোট ছয়টি হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোকে সহীহ বা হাসান প্রমাণ করেছিলাম। যদি শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে আর কোন হাদীস না থাকত, তবে এই তিনটি হাদীসই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত।

এই পর্বে আমরা আরও দুইটি হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সাথে সাথে এই হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মতামত পর্যালোচনা করব।

সপ্তম হাদীছ (صحيح بشواهده)

হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিতঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন, শাবানের পনের তারিখ রাতে আল্লাহ তাআলা মুশরিক এবং বিদ্বৈষী ছাড়া সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেন।

উক্ত হাদীসটিঃ

- ১। ইমাম হাইছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদে
- ২। বাযযার তাঁর মুসনাদে

সংকলন করেছেন।

#### প্রথম মন্তব্যঃ

এই হাদীছ সম্পর্কে হাফিয় হাইছামী বলেনঃ

“ বাযযার তাঁর মুসনাদে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। এর সনদে হিশাম ইবনু আবদির রহমাননামক একজন রাবী আছেন। তাঁর পরিচয় আমি জানি না। এছাড়া অন্যান্য সকল রাবী ছিঁকহা ”

( মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ খ-৮ , পৃ-৬৫ )

#### দ্বিতীয় মন্তব্যঃ

মাজমাউয যাওয়ায়েদের মুহাক্কিক উক্ত হাদীছে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ

“ এই হাদীছটিকে হিশামের সমর্থন যোগায় মত কেউ বর্ণনা করেন নি এবং হিশাম থেকে আব্দুল্লাহ ইবনে গালিব হাদীছটি নিয়েছেন। ইবনু গালিব একজন নির্ভরশীল রাবী। ”

#### তৃতীয় মন্তব্যঃ

হাদীছ পর্যালোচক শায়খ শুয়াইব আল আরনাউতু এ হাদীছের ব্যাপারে মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বলের টিকায় আব্দুল্লাহ বিন আমরের সূত্রে হাদীছটিকে উদ্ধৃত করার পর বলেনঃ حديث صحيح بشواهده অর্থাৎ অন্যান্য হাদীছের পৃষ্ঠপোষকতায় এ হাদীছটি সহীহ বলে সাব্যস্ত। অতঃপর তিনি হাদীছটির সমর্থনে আরো সাতটি হাদীছ পেশ করেন। এর মধ্যে ষষ্ঠ হাদীছটি হলো আলোচ্য হাদীছটি। অবশেষে তিনি আবু হোরাযরার উক্ত হাদীছ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ

“ এসব সমর্থিত হাদীছগুলোর প্রত্যেকটির সূত্রে কিছুটা অসুবিধা থাকলেও সব হাদীছের সমষ্টি দ্বারা মূল হাদীছটি সহীহ ও শক্তিশালী হওয়ার মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। অতএব আলোচ্য আবু হোরাযরা (রঃ) থেকে বর্ণিত আলোচ্য হাদীছ অন্যান্য হাদীছের সমর্থন পাওয়ায় সহীহ বলে সাব্যস্ত। ”

( মুসনাদে আহমদঃ খ-১১ , পৃ-৩১৬ )

#### সার কথাঃ

হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসটিকে একজন রাবীর দুর্বলতার জন্য অনেক মুহাদ্দিসীনগণ একক ভাবে দুর্বল বলেছেন। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী কোন দুর্বল হাদীসের সমর্থনে অন্য হাদীস থাকে, তাহলে ঐ হাদীসটি আর দুর্বল থাকে না। তখন দুর্বল হাদীসটি হাসান পর্যায়ে চলে যায় আর তা বর্ণনাও করা যায়। আর এ ক্ষেত্রে উপরোক্ত হাদীসটির সমর্থনে আবু বকর ছিদ্দীক (রঃ) এর সহীহ হাদীছ, হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রঃ) এর সহীহ হাদীস, হযরত আবু মুসা আশআরী (রঃ) এর হাসান হাদীছ সহ মোট ৮ টি হাদীস পাওয়া যায়। তাই হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী এটি আর দুর্বল থাকবে না বরং সমষ্টিগত ভাবে সহীহ বা হাসান হয়ে যাবে। তাই তো প্রখ্যাত হাদীস পর্যালোচক আল্লামা নাসিরুদ্দীন

আলবানী (রহঃ) এর বিশিষ্ট শিষ্য শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত্ উক্ত হাদীসটিকে সহীহ ও শক্তিশালী বলেছেন।

উপরন্তু ফাযায়েলে আমালের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীস গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য, এতে ইমামদের ইজমা রয়েছে। তাই এ হাদীসকে বাতিল বলার কোন অবকাশ নেই।

অষ্টম হাদীছ( حديث صحيح بشواهده )

হযরত আউফ ইবনু মালিক (রঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ তাতালা শা' বান মাসের পনের তারিখ দিবাগত রজনীতে নিজ সৃষ্টিজীবের উপর বিশেষ রহমত প্রকাশ করেন। তাই মুশরিক ও হিংসাকাতর লোক ব্যতীত সকলকে তিনি ক্ষমা করে দেন।

উক্ত হাদীসটিঃ

১। ইমাম হাইছামী তাঁর মাজমাউয যাওয়ায়েদে

২। বাযযার তাঁর মুসনাদে

সংকলন করেছেন।

হাদীছটির অবস্থান পর্যালোচনাঃ

উক্ত বর্ণনা সম্পর্কে হাফিয হাইছামী বলেনঃ

“ বাযযার হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীছের সনদে আব্দুর রহমান ইবনু যিয়াদ ইবনু আনআম রয়েছে যাকে আহমদ ইবনু সালিহ ছিক্রাহ বলেছেন। অথচ অধিকাংশ ইমাম তাকে দুর্বল বলেছেন। আর ইবনু লাহীআহ অনির্ভরযোগ্য। অন্যরা সব ছিক্রাহ তথা নির্ভরযোগ্য। ”

( মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ খ-৮ , পৃ-৬৫ )

সারকথাঃ

উপরোক্ত পর্যালোচকদের মন্তব্য দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে, উক্ত হাদীছে কেবল মাত্র একজন রাবী দুর্বল। আর ইবনু লাহী' আহ অনির্ভরযোগ্য হলেও অগ্রহণযোগ্য নয় কারণ তাঁর হাদীছ তো হাসান। এছাড়া অবশিষ্ট সকল রাবী নির্ভরযোগ্য।

( উল্লেখ্য, ইবনু লাহী'আহ সম্পর্কে যে দুর্বলতার কথা উল্লেখ রয়েছে, তা সহীহ ও হাসান হাদীছের মধ্যে পার্থক্যকারী দুর্বলতা, দুর্বল হাদীস হওয়ার জন্য যে দুর্বলতা, তা নয়। তা আমি আগেই প্রমাণ করে এসেছি। )

যেহেতু হাদীছটি আরো অন্যান্য হাদীছের সহযোগিতা ও সমর্থন পাচ্ছে সুতরাং হাদীছটি প্রমাণিত বলা যায়। উপরন্তু শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত্ যিনি সময়কালের বিশিষ্ট হাদীছ পর্যালোচক তিনি মুসনাদে আহমদের টীকায় শবেবরাত সম্পর্কিত হাদীছ এর সমর্থনকারী হাদীছ আখ্যা দিয়ে মোট সাতটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীছটি সপ্তম নম্বরে এনেছেন। অতঃপর তিনি হাদীছগুলোর উপর যে মন্তব্য করেছেন তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এতে প্রমাণিত হয় যে, এসব হাদীছের সনদের ব্যাপারে কিছু আপত্তিকর মন্তব্য থাকলেও সবগুলো হাদীছ পারস্পরিক সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে সহীহ ও শক্তিশালী বলে সাব্যস্ত

আহলে হাদীস/সালাফী ভাইদের কাছে প্রশ্ন ও দাওয়াতঃ

উপরে বর্ণিত দুটি হাদীসেরই সনদের দিক থেকে কিছুটা দুর্বলতা দেখা যায়।

কিন্তু হাদীস গুলোর সমর্থনে আরও অনেক হাদীস থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এই হাদীস গুলো হাসান বা সহীহের পর্যায়ে চলে আসে।

তৃতীয়ত, হাদীসগুলো কিছুটা দুর্বল হলেও ফাজায়েলের ক্ষেত্রে দুর্বল হাদীছ গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য। এটি উসূলে হাদীসের অন্যতম একটি নীতিমালা।

অন্যদিকে হাদীসের তাহকীক তথা বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সালাফী/আহলে হাদীছ ভাইরাযার সবচেয়ে বেশি ভক্ত, যার কিতবাদি অনুবাদ করে আপনারা প্রচার করে থাকেন, সময়কালের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ নাসিরউদ্দীন আলবানীও (রহঃ) হযরত মুয়ায বিন জাবাল (রঃ) এর হাদীছের পৃষ্টপোষকতায় হযরত আবু হুরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং একে অপরের সমর্থনে হাদীসকে সহীহ বলেছেন।

পাশাপাশি তাঁর অন্যতম শিষ্য শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত্বও উপরে বর্ণিত শবে বরাতের ফযীলত বিষয়ক হাদীসগুলোকে একটিতে সহীহ বা হাসান বলেছেন।

তাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তাহলে কেন আপনারা বার বার বলেন যে, শবে বরাতের ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বা হাসান হাদীসও বর্ণিত নেই??

এখন সালাফী বা আহলের হাদীসের ঐসব বন্ধুদের প্রতি দাওয়াত রইল, আপনারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), শায়খ আলবানী (রহঃ) এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরজ করতে চাই যে, আপনারা যদি শায়খ ইবনে বাযের (রহঃ) অনুসরণে বা নিজেদের তাহকীক মতো এই রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে পারেন তাহলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিছ ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযীলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সব ধরনের বেদআত রসম-রেওয়াজ পরিহার করে নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন তারাই এমন কি অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা ভুলের সম্ভাবনার উর্ধ্বে নয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং বাতিলপন্থিদের মিশন সফল করতে সহায়তা দেওয়া কি সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি প্রয়োজন? এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আপনারা আপনাদের মতটিকে খুব বেশি হলে একটি ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনায়ুক্তই মনে করেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতটিকে একেবারে ওহীর মতো মনে করেন না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা আর থাকে কি না?

আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) [মৃ. ৭২৮ হিঃ] এর ইক্তিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম য়াযনুদ্দীন ইবনে রজব (রহঃ) [মৃ. ৭৯৫] এর লাতায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায (রহঃ) এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? যা হযরত তিনি শবে বরাত নিয়ে জাহেল লোকদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, বাড়াবাড়ির প্রতিকার কোন বাস্তব সত্য অস্বীকার করে নয়, বরং সত্য বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

শেষ কথাঃ

যদি অন্যান্য রাতের উপর এ রাতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই থাকবে, তবে বিশেষভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করারই বা কি প্রয়োজন? শুধু এই রাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমেই অন্যান্য রাতের উপর এর বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

উপরের হাদীসগুলো থেকে স্পষ্টতই এটা প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রে আল্লাহ পাক তাঁর বিপুল সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করেন। যে রাত্রে আল্লাহ বিশেষভাবে ক্ষমার ওয়াদা করেছেন, সেই রাতে কাকুতি মিনতি করে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এটাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া, তওবা করা বা যে কোন দোয়া করার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কোন ভাল আমলের মাধ্যমে দোয়াটিকে শক্ত করা যাতে দ্রুত কবুল হয়। বুখারী শরীফের তিন জন যুবকের কাহিনী হতে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যারা পাহাড়ের গুহাতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। পরে একজনের পরামর্শে প্রত্যেকের ভাল আমল উল্লেখ করে দোয়া করলে আল্লাহ তাদের মুক্ত করেন। তাছাড়া অনেক হাদীসেই নফল নামায পড়ে দোয়া করা, কোরআন তিলাওয়াত করে দোয়া করা, জিকির আযকার করে দোয়া করা ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে সুতরাং মধ্য শাবানের এই রাতে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে সালাত যিকির, কোরআন তিলাওয়াত করাও প্রমাণিত হয়। এরপরও যদি কেউ বলে থাকেন যে, এই রাতে কোন ইবাদত করা যাবে না, তাহলে তা তার নিজের মনগড়া কথা বা প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

এজন্যই বহু ইমামগণই এ রাতের নফল ইবাদত করাকে মুস্তাহাব বলেছেন এবং নিজেরাও বেশি বেশি ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। যেমনঃ ইমাম শাফিঈ, ইমাম নববী, ইমাম বাযযার, ইমাম উকায়লী, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সহ আরও অনেকে যার বিবরণ সামনে আরও আসবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব, যারা এ কথা বলে থাকেন যে, শবে বরাতের কোন ভিত্তি নেই, এর ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই, তারা রসূলের (সঃ) হাদীসের নামে মিথ্যাচার করেন এবং উম্মতকে রসূল (সঃ) এর সুন্নত ও নেক আমল থেকে দূরে সরে রাখানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের এই হীন চক্রান্তকে আমরা খিকার জানাই।

এরকম একটি ফযীলতপূর্ণ রাত পেয়েও যে ইবাদতে কাটাতে পারল না, সে চরম দুর্ভাগা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেনঃ

আমি জীবন ও ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

এই আয়াত থেকেই বুঝা যায়, আমাদের বেশি বেশি ইবাদত করা প্রয়োজন। উপরন্তু যদি ফযীলতপূর্ণ রাত পাওয়া যায়, তাহলে বেশি বেশি ফযীলত পাওয়ার জন্য ঐ রাতে বেশি বেশি ইবাদত করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পর্ব ১৫

হাদীছের আলোকে শবে বরাত - ৭

গত কয়েক পর্বে আমরা শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত মোট আটটি হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোকে সহীহ বা হাসান প্রমাণ করেছিলাম। যদি শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে আর কোন হাদীস না থাকত, তবে এই হাদীসগুলোই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত।

এই পর্বে আমরা আরও একটি হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সাথে সাথে এই হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মতামত পর্যালোচনা করব।

নবম হাদীছ( حديث صحيح بشواهده واسناده مرسل جيد )

কাসীর ইবনু মুররাহ আল হায়রামী থেকে বর্ণিত, হুযুর (সঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ তা' আলা শাবানের পনের তারিখ রাত্রি অবতরণ করতঃ মুশরিক এবং হিংসাপরায়ণ লোক ছাড়া অন্যান্য সকলের গুনাহ মার্ফ করে দেন।

উক্ত হাদীছটি

- ১। ইবনে আবী শাইবা তাঁর মুসান্নাফে
- ২। হাফেজ আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসান্নাফে
- ৩। ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে
- ৪। হাফেয মুনিযীরী তাঁর তারগীব ওয়াত তারহীবে

সংকলন করেছেন।

**হাদীছটির সূত্রের অবস্থানঃ**

শুয়াবুল ঈমানে বর্ণিত সূত্রে রাবীগণের ব্যাপারে হাদীছ পর্যালোচকদের মন্তব্য নিম্নরূপঃ

- ১। রাবী আবুল হাসান বিন ফযল আলকাত্তান।

তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য হলঃ

খতীব বাগদাদী ইবনুল ইমাদ আল হাম্বলী এবং হাফিয যাহাবীসহ অনেকেই তাকে নির্ভরযোগ্য ও বহু হাদীছের বর্ণনাকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

( তারীখে বাগদাদ )

- ২। আবু সাহাল বিন যায়াদ আল কাত্তান।

তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য হলোঃ

হাফেয যাহাবী এবং খতীব বাগদাদী তাঁর ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য ও সত্যবাদী বলে মন্তব্য করেছেন।

( তারীখে বাগদাদ; সিয়রু আলামিন নুবালা )

- ৩। ইসহাক ইবনে হাসান আল হারবী।

তাঁর সম্পর্কে হাফেয যাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ বিন হাম্বল এবং ইবনু হাজার আসকালানী সকলেই বলেছেনঃ

ثقة حجة

অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য ও দলীলরূপে সাব্যস্ত।

( দেখুনঃ মীযানুল ইতেদালঃ ১/১৯০ )

- ৪। আফফান বিন মুসলিম আল বাসারী।



তাঁর সম্পর্কে ইবনে মুঈন আবু হাতিম এবং ইবনু হাজার মন্তব্য করেনঃ

اصحاب الحديث ثقة ثبت متقن

অর্থাৎ বড় মাপের মুহাদ্দিছ, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, অতি মজবুত।

৫। আব্দুল ওয়াহিদ বিন যিয়াদ।

তাঁর সম্পর্কে ইবনে সাআদ আবু হাতিম, আবু যুরআ এবং ইবনে হাজার বলেনঃ

ثقة

অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য।

৬। হাজ্জাজ বিন আরতাত্ত।

তাঁর সম্পর্কে আবু যুরআ বলেনঃ

صدوق يدلّس

অর্থাৎ সত্যবাদী তবে তাদলীস করেন।

আবু হাতিম বলেনঃ

صدوق يدلّس عن الضعفاء يكتب حديثه

অর্থাৎ সত্যবাদী, তাদলীস করেন তবে তাঁর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য।

( তাহযীবুল কামাল )

ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন বলেন, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত্ত ইমাম মাকহূল থেকে হাদীছ শুনেছেন। বহুক্ষেত্রে তা স্পষ্টভাবে

سمعت مكحولاً

বলে উল্লেখ করেছেন।

( দেখুনঃ তারীখে বাগদাদ )

ইমাম নাসাঈ মন্তব্য করেছেনঃ তিনি তেমন মজবুত নন।

ইবনে হাজার বলেনঃ সত্যবাদী তবে অনেক বেশি ভুল করেছেন।

সময়কালের হাদীছ পর্যালোচক শায়খ আল আরনাউত্ব তাঁর ব্যাপারে মন্তব্য করেনঃ

তিনি সত্যবাদী, হাদীছ বর্ণনায় উত্তম ব্যক্তি, তাদলীস করেন, سمعت বা حدثنا না বললে সে বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হয় না, তাঁর ব্যাপারে বেশি ভুল করার মন্তব্য অতিরঞ্জিত।

( তাহরীর তাকরীবুত তাহযীবঃ ১১১৯ )

৭। মাকহুল (রহঃ)। প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিছ। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে

ثقة فقيه تابعي كثير الارسال

নির্ভরযোগ্য, ফিকহের ইমাম, তাবেয়ী ও তার ইরসাল করা প্রসিদ্ধ।

**হাদীছটির অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনাঃ**

হাফিয মুনযিরী হাদীছটিকে আততারগীব ওয়াত-তারহীব এ এনেছেন , তিনি বলেনঃ

“ বাইহাকী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটি একটি চমৎকার মুরসাল হাদীছ। হাদীছটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত আছে। মাকহুল তা বর্ণনা করেছেন। আবু ছা’ লাবাহ (রঃ) থেকে সেটিও চমৎকার মুরসাল হাদীছ। ”

**সারকথাঃ**

হাদীছটি মুরসাল, তবে গ্রহণযোগ্য, উত্তম মুরসাল। মুরসাল হানাফী ও মালেকীদের নিকট এমনিতেই গ্রহণযোগ্য। **جيد** (উত্তম) হলে তো আরো ভাল কথা। তাছাড়া এ হাদীছটি বহু হাদীছের সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য ও আমলের ক্ষেত্রে সঠিক বলে সাব্যস্ত

**আহলে হাদীস/সালাফী ভাইদের কাছে প্রশ্ন ও দাওয়াতঃ**

উপরে বর্ণিত হাদীসটিই মুরসাল হাদীস এবং উত্তম মুরসাল । যা হানাফী ও মালেকী ইমামদের নিকট এমনিতেই গ্রহণযোগ্য, উপরন্তু শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মুরসাল হাদীস মানার পিছনে যে শর্ত আছে, তাও পূরণ করে।

তাছাড়া হাদীসটার সমর্থনে আরও অনেক হাদীস থাকায় উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী এই হাদীস গুলো হাসান বা সহীহের পর্যায়ে চলে আসে।

তাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তাহলে কেন আপনারা বার বার বলেন যে, শবে বরাতে ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বা হাসান হাদীসও বর্ণিত নেই??

এখন সালাফী বা আহলের হাদীসের ঐসব বন্ধুদের প্রতি দাওয়াত রইল, আপনারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), শায়খ আলবানী (রহঃ) এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরজ করতে চাই যে, আপনারা যদি শায়খ ইবনে বাযের (রহঃ) অনুসরণে বা নিজেদের তাহকীক মতো এই রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে পারেন তাহলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযীলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সব ধরনের বেদআত রসম-রেওয়াজ পরিহার করে নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন তারাই এমন কি অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা ভুলের সম্ভাবনার উর্ধ্বে নয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং বাতিলপন্থিদের মিশন সফল করতে সহায়তা দেওয়া কি সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি প্রয়োজন? এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আপনারা

আপনাদের মতটিকে খুব বেশি হলে একটি ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনায়ুক্তই মনে করেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতটিকে একেবারে ওহীর মতো মনে করেন না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা আর থাকে কি না?

আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) [মৃ. ৭২৮ হিঃ] এর ইক্তিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (রহঃ) [মৃ. ৭৯৫] এর লাতায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায (রহঃ) এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? যা হয়ত তিনি শবে বরাত নিয়ে জাহেল লোকদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, বাড়াবাড়ির প্রতিকার কোন বাস্তব সত্য অস্বীকার করে নয়, বরং সত্য বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

### শেষ কথাঃ

যদি অন্যান্য রাতের উপর এ রাতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই থাকবে, তবে বিশেষভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করারই বা কি প্রয়োজন? শুধু এই রাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমেই অন্যান্য রাতের উপর এর বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

উপরের হাদীস থেকে স্পষ্টতই এটা প্রমাণিত হয় যে, এ রাত্রে আল্লাহ পাক তাঁর বিপুল সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করেন। যে রাত্রে আল্লাহ বিশেষভাবে ক্ষমার ওয়াদা করেছেন, সেই রাতে কাকুতি মিনতি করে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এটাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া, তওবা করা বা যে কোন দোয়া করার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কোন ভাল আমলের মাধ্যমে দোয়াটিকে শক্ত করা যাতে দ্রুত কবুল হয়। বুখারী শরীফের তিন জন যুবকের কাহিনী হতে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যারা পাহাড়ের গুহাতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। পরে একজনের পরামর্শে প্রত্যেকের ভাল আমল উল্লেখ করে দোয়া করলে আল্লাহ তাদের মুক্ত করেন। তাছাড়া অনেক হাদীসেই নফল নামায পড়ে দোয়া করা, কোরআন তিলাওয়াত করে দোয়া করা, জিকির আযকার করে দোয়া করা ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং মধ্য শাবানের এই রাতে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে সালাত যিকির, কোরআন তিলাওয়াত করাও প্রমাণিত হয়। এরপরও যদি কেউ বলে থাকেন যে, এই রাতে কোন ইবাদত করা যাবে না, তাহলে তা তার নিজের মনগড়া কথা বা প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

এজন্যই বহু ইমামগণই এ রাতের নফল ইবাদত করাকে মুস্তাহাব বলেছেন এবং নিজেরাও বেশি বেশি ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। যেমনঃ ইমাম শাফিঈ, ইমাম নববী, ইমাম বাযযার, ইমাম উকায়লী, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সহ আরও অনেকে যার বিবরণ সামনে আরও আসবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব, যারা এ কথা বলে থাকেন যে, শবে বরাতের কোন ভিত্তি নেই, এর ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই, তারা রসূলের (সঃ) হাদীসের নামে মিথ্যাচার করেন এবং উম্মাতকে রসূল (সঃ) এর সুন্নত ও নেক আমল থেকে দূরে সরে রাখানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের এই হীন চক্রান্তকে আমরা ধিক্কার জানাই।

এরকম একটি ফযীলতপূর্ণ রাত পেয়েও যে ইবাদতে কাটাতে পারল না, সে চরম দুর্ভাগা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেনঃ

আমি জীবন ও ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

এই আয়াত থেকেই বুঝা যায়, আমাদের বেশি বেশি ইবাদত করা প্রয়োজন। উপরন্তু যদি ফযীলতপূর্ণ রাত পাওয়া যায়, তাহলে বেশি বেশি ফযীলত পাওয়ার জন্য ঐ রাতে বেশি বেশি ইবাদত করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পর্ব ১৬

হাদীছের আলোকে শবে বরাত - ৮

গত কয়েক পর্বে আমরা শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত মোট নয়টি হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোকে সহীহ বা হাসান প্রমাণ করেছিলাম। যদি শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে আর কোন হাদীস না থাকত, তবে এই হাদীসগুলোই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত।

এই পর্বে আমরা আরও একটি হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সাথে সাথে এই হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মতামত পর্যালোচনা করব।

দশম হাদীছ ( اسنادہ ضعیف )

উছমান ইবনু আবিল আস নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ যখন শা' বান মাসের পনের তারিখ রাত আগমণ করে তখন জনৈক আহবানকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবান করতে থাকেন যে, আছো কি কোন ক্ষমার ভিখারী তাকে আমি ক্ষমা করে দিবো? আছো কি কোন যাচনাকারী যাকে আমি দান করবো? অতঃপর যে কেউ চায় আল্লাহ তাআলা তাকে তাই দান করেন। কিন্তু ব্যভিচারিনী এবং মুশরিক ছাড়া।

উক্ত হাদীছটি ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে সংকলন করেছেন।

উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে পর্যালোচনাঃ

১। উক্ত হাদীছটি ইমাম বাইহাকী আলী ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু বিশর থেকে বর্ণনা করেন।

যার সম্পর্কে খতীব আল বাগদাদী বলেনঃ

“ তিনি সত্যবাদী, নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত এবং উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ”

( তারীখে বাগদাদঃ খ-১২ , পৃ-৯৯ )

২। আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনু আমর আর রায়যায (মৃঃ ৩৩৯ হিঃ)

যার সম্পর্কে হাকেম বলেনঃ

“ তিনি নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য ছিলেন। ”

( সিয়রু আলামিন নুবালাঃ খ-১৫ , পৃ-৩৮৬ )

খতীব আল বাগদাদী বলেনঃ

“ তিনি নির্ভরযোগ্য ও আস্থাযোগ্য ছিলেন। ”

( তারীখে বাগদাদঃ খ-৩ , পৃ-১৩২ )

৩। মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আর রিয়াহী (মৃঃ ২৭৬ হিঃ)

যাঁর সম্পর্কে ইমাম দারা কুতনী বলেনঃ

“ তিনি সত্যবাদী। ”

খতীব আল বাগদাদী বলেনঃ

“ আমি তাঁর সম্পর্কে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমদকে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি বলেছেনঃ মুহাম্মদ সত্যবাদী। ”

( তারীখে বাগদাদঃ খ-১ , পৃ-৩৭২ )

৪। জামি ইবনুস সবীহ আর রমলী

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেনঃ

“ তাঁর সম্পর্কে আব্দুল গণী ইবনু সাঈদ মুশতাবিহ এর মধ্যে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন তিনি একজন দুর্বল রাবী। এবং ইবনে আবী হাতিম স্বীয় গ্রন্থ আল জরহি ওয়াততাদীলে যাকে উল্লেখ করে কোন আলোচনা ও সমালোচনা করেন নি এবং বলেছেন যে তাঁর থেকে ইমাম আবু যুরআ ও ইবনে মাজীন হাদীছ গ্রহণ করেছেন। ”

( খ-১ , পৃ-৫৩০ )

( উল্লেখ্য যে, ইবনু আবী হাতিম কারো ব্যাপারে চুপ থাকলে ঐ রাবী নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত হয়। )

৫। মারহূম ইবনু আবদিল আজীজ

হাফিয ইবনু হাজার তার সম্পর্কে বলেছেনঃ

“ তিনি অষ্টম স্তরের একজন নির্ভরযোগ্য রাবী। ”

( তাকরীবুত তাহযীবঃ খ-২ , পৃ-১৬৯ )

ইমাম আহমদ, নাসাঈ, ইবনু মাজীন প্রমুখও তাঁকে ছিকাহ বলেছেন। হাফিয যাহাবী, ইবনু হিব্বানও তাঁকে ছিকাহ এর মধ্য থেকে বিবেচনা করেছেন।

৬। দাউদ ইবনু আবদির রহমান আল আততার

তাঁর সম্পর্কে আবু হাতিম বলেছেনঃ

“ তিনি গ্রহণযোগ্য। একজন নেককার ছিলেন। ”

( তাহযীবুল কামালঃ খ-৮ , পৃ-৪১৫ )

যাহাবী (রহঃ) বলেনঃ

ثقة তিনি নির্ভরযোগ্য।

ইয়াহইয়া ইবনু মঈন বর্ণনা করেন যে,

তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন।

হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী বলেনঃ

তিনি ছিকাহ রাবী।

৭। হিশাম ইবনু হাসসান আল আযদী

তঁর সম্পর্কে হাদীছ পর্যালোচকদের মন্তব্য সমষ্টিগতভাবে নিম্নে পেশ করা হলঃ

হাফিজ ইবনু হাজার, উছমান বিন আবী শায়বা, ইবনে হিব্বান, ইমাম আবু হাতিম, ইবনু মঈন, আল আজালী, ইবনু সাআদ, ইবনু আদী প্রমূখ ইমামদের দৃষ্টিতে তিনি নির্ভরযোগ্য সত্যবাদী বহু হাদীছের বর্ণনাকারী ছিলেন।

( তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-১১ , পৃ-৩৩ ; জরাহ ওয়াত তাদীলঃ খ-৯ , পৃ-৫৪ )

তবে ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) তার সম্পর্কে বলেনঃ

“ হিশাম হাসান বসরী এবং আতা থেকে যেসব হাদীছ বর্ণনা করেছেন, সেগুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিছগণ প্রশ্ন তুলেছেন, কারণ হিশাম হাদীছের মধ্যে ইরসাল (রাবী এর নাম উল্লেখ না করা) করতেন। তাই মুহাদ্দিছগণ মনে করেন, হিশাম এসব হাদীছ হাওশাব এর কিতাব থেকে নিয়েছেন। (সরাসরি আতা ও হাসান থেকে নেননি।) ”

( তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-১১ , পৃ-৩৫ )

ইবনু আদী বলেনঃ

“ আরআরা বলেনঃ আমাকে জারীর বলেছেনঃ আমি সাত বছর যাবৎ হাসান বসরী (রহঃ) এর দরসে বসেছি। কিন্তু হিশামকে কখনো তাঁর সাথে দেখিনি। আমি (আরআরা) বললামঃ হে আবু নাসর (জারীর)! হিশাম তো আমাদেরকে হাসান বসরী (রহঃ) এর সূত্রে বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আর আমরা হিশাম থেকে বর্ণনা করেছি। সুতরাং আপনার ধারণা মতে হিশাম এসব হাদীছ কার নিকট থেকে গ্রহণ করেছেন? জারীর প্রতি উত্তরে বললেনঃ আমার ধারণা মতে তিনি হাওশাব থেকে গ্রহণ করেছেন। ”

( সিয়ারু আলামিন নুবালাঃ খ-৬ , পৃ-৩৫৫ ; মীযানুল ইতিদালঃ খ-৪ , পৃ-২৯৫ )

**পর্যালোচনাঃ**

অতএব, ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং আরআরা (রহঃ) কর্তৃক উল্লেখিত বিবরণ দ্বারা বুঝা যায় যে, হিশাম ইবনু হাসসান সরাসরি হাসান বসরী (রহঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেননি। বরং মাঝখানে আরো একজন রাবী আছেন, হিশাম যাঁর নাম তাঁর সনদে উল্লেখ করেন নি। হাদীছ শাস্ত্রের পরিভাষায় এটাকে তাদলীস বলা হয়। আর মুহাদ্দিছীনে কেরামের কাছে সিকাহ (ثقة) রাবী এর তাদলীছ গ্রহণযোগ্য।



যথা তাদরীবুর রাবী ও কাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীছ গ্রন্থে এ নীতিমালা উদ্ধৃত হয়েছে যে,

“ বাযযার এর ভাষ্যমতে ছিকাহ রাবীগণের মধ্য থেকে কেউ তাদলীস করলে তাঁর তাদলীস উলামাদের নিকট গ্রহণযোগ্য। ”

( তাদরীবুর রাবীঃ খ-১ , পৃ-২২৯ ; কাওয়ায়িদ ফী উলূমিল হাদীছঃ পৃ-১৫৯ )

৮। হাসান ইবনু আবিল হাসান আল বাসরী

তিনি একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ।

হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ

তিনি হযরত আলী (রঃ), হযরত তালহা (রঃ) এবং হযরত আয়শা (রঃ) এর সাক্ষাত লাভ করেছেন। সওবান (রঃ), আম্মার ইবনে ইয়াসির (রঃ), উসমান ইবনু আবিল আস (রঃ) এবং মা' কাল ইবনু সিনান (রঃ) প্রমুখ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁদের থেকে শ্রবণের মর্যাদা লাভ করেন নি।

আজলী তাঁর সম্পর্কে বলেনঃ হাদীছ বিশারদগণের মন্তব্য এরকমঃ

“ আল আদাভী বলেন, সকলেই এই শায়খ অর্থাৎ হাসানের নিকট যাও, হাদীছ গ্রহণ কর, তিনি সবচেয়ে বড় আলেম। তিনি বসরাবাসীদের শায়খ (ইমাম), তিনি তাবেঈ, নির্ভরযোগ্য বুজুর্গ, হাদীছের বাহক। ”

( জরাহ ওয়াত তাদীলঃ খ- ৩ , পৃ-৪০ ; তাবকাত; তাহযীবুত তাহযীব )

এসব দ্বারা প্রমাণ হয় তিনি কত বড় আলেম ও ছিকাহ নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ।

তবে তাঁর ব্যাপারে দুটি মন্তব্য ব্যতিক্রম যা নিম্নে পেশ করা হলোঃ

১। বাযযার তাঁর মুসনাদে এ বলেনঃ

“ হাসান বসরী তিনি ইবনু আব্বাস, আসওয়াদ, উবাদা এবং উছমান থেকে শ্রবণমর্যাদা লাভ করেন নি। ”

( তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-২ , পৃ-২৩৫ )

২। হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ

“ হাসান বসরী একজন ছিকাহ রাবী, প্রসিদ্ধ ফক্বীহ। তিনি ইরসাল ও তাদলীস করতেন। ”

( তাহযীবুত তাহযীবঃ খ-১ , পৃ-২০২ )

**পর্যালোচনাঃ**

বাযযার এবং হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) এর উক্ত মন্তব্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম হাসান বসরী (রহঃ) উছমান উবনু আবিল আস থেকে হাদীছটি সরাসরি বর্ণনা করেন নি। বরং তিনি তাদলীস করেছেন। তবে হাসান বসরী (রহঃ) যেহেতু একজন নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী, ফিক্বহ-হাদীছের ইমাম এবং একজন

সুপ্রসিদ্ধ তাবিঈ, তাই তাঁর কৃত তাদলীস গ্রহণযোগ্য হবে। হাদীছটির প্রমাণে কোন অন্তরায় হবে না তা তাদরীব ও কাওয়ায়েদ ফী উলুমিল হাদীছ-এ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

৯। উছমান আবিল আস আস সাক্বাফী

তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী। হযরত মুআবিয়া (রঃ) এর খেলাফতকালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

**হাদীছটির অবস্থানঃ**

উল্লেখিত বিবরণ দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত হাদীছটির সনদে জামী ইবনুস সাবীহ আর রামালী ব্যতীত সকল রাবীই নির্ভরযোগ্য ও আস্থাযোগ্য। হাদীছটির সনদের মাত্র একজন রাবী আছেন, যিনি বিতর্কিত হেতু কেউ কেউ যঈফ বলেছেন। ইবনু আবি হাতিম চূপ থেকে তার নির্ভরযোগ্যতা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই হাদীছের সমর্থনেও যেহেতু আরো হাদীছ বিদ্যমান, বিধায় হাদীছটি উন্নীত হয়ে হাসান স্তরে পৌঁছে যায়। একারণেই শুয়াবুল ঈমানের মুহাক্কিক আদনান আব্দুর রহমান اسناد حسن বলে সূত্রের দিক থেকে হাদীছটিকে হাসান বলে রায় প্রদান করেছেন।

( দেখুন শুয়াবুল ঈমানঃ খঃ ৩, পৃ – ৩৮৩ )

তবে শুয়াবুল ঈমানে মুহাক্কিক শাইখ যাগলুল এর মন্তব্য হলোঃ

“ হাদীছটির সনদ দুর্বল। হাসান বসরী তাবেঈ এর সাক্ষাত উসমান বিন আবিল আস (রঃ) সাহাবীর সাথে হয়নি, (মোব্বাখানে রাবীর উল্লেখ নেই।) ”

( হাশিয়াহ শুয়াবুল ঈমান )

এ ব্যাপারে تدریب الراوى এবং علوم الحديث এর উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হাসান বসরীর মত বিখ্যাত তাবেঈ ও মুহাদ্দিছ এর এধরণের তাদলীস সূত্র বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় নয় বরং তা সকল উলামার নিকট গ্রহণযোগ্য বিধায় এ হাদীছকে হাসান বা সহীহ বলে যে মন্তব্য আদনান আব্দুর রহমান করেছেন তা যথাযথ এবং সঠিক বলে সাব্যস্ত।

**আহলে হাদীস/সালাফী ভাইদের কাছে প্রশ্ন ও দাওয়াতঃ**

সালাফী বা আহলের হাদীসের ঐসব বন্ধুদের প্রতি দাওয়াত রইল, আপনারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), শায়খ আলবানী (রহঃ) এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরজ করতে চাই যে, আপনারা যদি শায়খ ইবনে বাযের (রহঃ) অনুসরণে বা নিজেদের তাহকীক মতো এই রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে পারেন তাহলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযীলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সব ধরনের বেদআত রসম-রেওয়াজ পরিহার করে নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন তারাই এমন কি অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা ভুলের সম্ভাবনার উর্ধ্বে নয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং বাতিলপন্থিদের মিশন সফল করতে সহায়তা দেওয়া কি সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি প্রয়োজন? এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আপনারা আপনাদের মতটিকে খুব বেশি হলে একটি ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনায়ুজ্জই মনে করেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতটিকে একেবারে ওহীর মতো মনে করেন না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা আর থাকে কি না?

আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) [মৃ. ৭২৮ হিঃ] এর ইক্তিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (রহঃ) [মৃ. ৭৯৫] এর লাভায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায (রহঃ) এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? যা হয়ত তিনি শবে বরাত নিয়ে জাহেল লোকদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, বাড়াবাড়ির প্রতিকার কোন বাস্তব সত্য অস্বীকার করে নয়, বরং সত্য বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

### শেষ কথাঃ

যদি অন্যান্য রাতের উপর এ রাতের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই থাকবে, তবে বিশেষভাবে এই রাতের কথা উল্লেখ করারই বা কি প্রয়োজন? শুধু এই রাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমেই অন্যান্য রাতের উপর এর বিশেষত্ব প্রমাণিত হয়।

উপরের হাদীস থেকে স্পষ্টতই এটা প্রমাণিত হয় যে, এ রাতে আল্লাহ পাক তাঁর বিপুল সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করেন। যে রাতে আল্লাহ বিশেষভাবে ক্ষমার ওয়াদা করেছেন, সেই রাতে কাকুতি মিনতি করে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে এটাই স্বাভাবিক। আর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়া, তওবা করা বা যে কোন দোয়া করার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল কোন ভাল আমলের মাধ্যমে দোয়াটিকে শক্ত করা যাতে দ্রুত কবুল হয়। বুখারী শরীফের তিন জন যুবকের কাহিনী হতে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যারা পাহাড়ের গুহাতে আটকা পড়ে গিয়েছিল। পরে একজনের পরামর্শে প্রত্যেকের ভাল আমল উল্লেখ করে দোয়া করলে আল্লাহ তাদের মুক্ত করেন। তাছাড়া অনেক হাদীসেই নফল নামায পড়ে দোয়া করা, কোরআন তিলাওয়াত করে দোয়া করা, জিকির আযকার করে দোয়া করা ইত্যাদির প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। সুতরাং মধ্য শাবানের এই রাতে আল্লাহর পক্ষ হতে বিশেষভাবে ক্ষমা প্রদর্শনের বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ার মাধ্যমে সালাত যিকির, কোরআন তিলাওয়াত করাও প্রমাণিত হয়। এরপরও যদি কেউ বলে থাকেন যে, এই রাতে কোন ইবাদত করা যাবে না, তাহলে তা তার নিজের মনগড়া কথা বা প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়।

এজন্যই বহু ইমামগণই এ রাতের নফল ইবাদত করাকে মুস্তাহাব বলেছেন এবং নিজেরাও বেশি বেশি ইবাদতে লিপ্ত ছিলেন। যেমনঃ ইমাম শাফিঈ, ইমাম নববী, ইমাম বাযযার, ইমাম উকায়লী, ইমাম তিরমিযী (রহঃ) সহ আরও অনেকে যার বিবরণ সামনে আরও আসবে ইনশাআল্লাহ।

অতএব, যারা এ কথা বলে থাকেন যে, শবে বরাতের কোন ভিত্তি নেই, এর ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বর্ণিত নেই, তারা রসূলের (সঃ) হাদীসের নামে মিথ্যাচার করেন এবং উম্মতকে রসূল (সঃ) এর সুন্নত ও নেক আমল থেকে দূরে সরে রাখানোই তাদের মূল উদ্দেশ্য। তাদের এই হীন চক্রান্তকে আমরা ধিক্কার জানাই।

এরকম একটি ফযীলতপূর্ণ রাত পেয়েও যে ইবাদতে কাটাতে পারল না, সে চরম দুর্ভাগা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেনঃ

আমি জ্বীন ও ইনসানকে শুধুমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

এই আয়াত থেকেই বুঝা যায়, আমাদের বেশি বেশি ইবাদত করা প্রয়োজন। উপরন্তু যদি ফযীলতপূর্ণ রাত পাওয়া যায়, তাহলে বেশি বেশি ফযীলত পাওয়ার জন্য ঐ রাতে বেশি বেশি ইবাদত করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

## হাদীছের আলোকে শবে বরাত - ৯

গত কয়েক পর্বে আমরা শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত মোট দশটি হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোর কয়েকটিকে সহীহ বা হাসান প্রমাণ করেছিলাম। যদি শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে আর কোন হাদীস না থাকত, তবে এই হাদীসগুলোই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত।

এই পর্বে আমরা আরও একটি হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সাথে সাথে এই হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মতামত পর্যালোচনা করব।

### একাদশ হাদীছ( اسناده ضعيف لكن ليس فيه كذاب )

হযরত আলী ইবনু আবী তালিব (রঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেনঃ শা' বান মাসের পনের তারিখ রাত আসলে তখন তার রাতের অংশে ইবাদত করো এবং দিনের অংশে রোজা রাখো। কারণ ওই রাতে সূর্যাস্ত যাওয়ার পর মহান আল্লাহ প্রথম আসমানে অবতরণ করে বলতে থাকেন, আছো কি কোন মাগফিরাতের প্রত্যাশী? তাকে আমি মাগফিরাত দান করবো। আছো কি কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি তাকে আমি সুস্থতা দান করবো। আছো কি অমুক আছো কি অমুক - এভাবে প্রভাতের সূচনা পর্যন্ত ডাকতে থাকেন।

### উক্ত হাদীছটি

- ১। ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে
- ২। ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে
- ৩। মুনিযীরী তাঁর তারগীব ওয়াত তারহীবে

সংকলন করেছেন।

### উক্ত হাদীছের সনদ পর্যালোচনাঃ

হাদীছটির সনদে নিম্নোক্ত রাবীগণ রয়েছেনঃ

- ১। হাসান ইবনু আলী আল খিলাল (মৃঃ ২৪২ হিঃ)

ইমাম নাসাঈ (রহঃ) ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহর প্রত্যেকেই তাঁর থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন।

খতীব আল বাগদাদী বলেনঃ ثقة حافظ , তিনি নির্ভরযোগ্য এবং হাফিযুল হাদীছ ছিলেন।

ইয়াকুব ইবনু শাইবাহ বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য ও আস্থাযোগ্য রাবী।

ইবনু হিব্বান তাঁকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে পরিগণিত করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজারও তাঁকে নির্ভরযোগ্য এবং হাফিযুল হাদীছ সাব্যস্ত করেছেন।

- ২। আব্দুর রাজ্জাক ইবনু হুমাম ইবনু নাফি (মৃঃ ২১১ হিঃ)

আসহাবে সিত্তাহর প্রত্যেকেই তাঁর কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন।

তিনি ইবনু জুরাই আওয়াযী, মালিক, সুফিয়ান সওরী প্রমুখের ন্যায় বড় বড় ইমামদের শাগরিদ।

আলী ইবনুল মাদীনী থেকে কথিত আছে যে, হিশাম ইবনু ইউসুফ বলেছেন, আব্দুর রাজ্জাক আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম এবং হাফিযে হাদীছ।

আহমদ ইবনু হাম্বল থেকে বর্ণিত যে, তিনি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাদীছ বর্ণনাকারী ছিলেন।

৩। ইবনু আবি সাবুরাহ (মৃঃ ১৬২ হিঃ)

তাঁর সম্পর্কে পরে উল্লেখ করা হচ্ছে।

৪। ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মদ।

ইমাম বুখারী আত-তারীখুল কাবীর গ্রন্থে এবং ইমাম যাহাবী মীজানুল ইতিদাল গ্রন্থে তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উভয়ের কেউই তাঁকে দুর্বল বলেন নি।

হাফিয ইবনু হাজার তাঁর ব্যাপারে বলেনঃ

صدوق من السادسة

“ তিনি ষষ্ঠ স্তরের একজন সৎ রাবী। ”

( তাকরীবুত তাহযীবঃ খ-১ , পৃ-৬৫ ; তাহযীবুল কামালঃ খ-২ , পৃ-১৯৩ )

ইবনে হিব্বান তাকে কিতাবুছছিকাতে উল্লেখ করে নির্ভরযোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন।

( দেখুনঃ كتاب الثقات পৃ – ১৯, খ – ১ )

৫। মুআবিয়া ইবনু আবদিলাহ ইবনু জাফর।

ইমাম নাসাঈ এবং ইবনু মাজাহ তাঁর কাছ থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন।

হাফিয আজালী তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

ইবনু হিব্বানও তাঁকে নির্ভরযোগ্যদের মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি চতুর্থ স্তরের একজন গ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী।

হাফিয যাহাবী বলেনঃ “ ثقة ” নির্ভরযোগ্য।

( দেখুনঃ আল কাশেফ – ২/২৭৬ )

৬। আব্দুল্লাহ ইবনু জা' ফর।

আল ইসাবা ফী তাময়িযিস সাহাবা গ্রন্থে ( ২য় খন্ড পৃঃ ২৮৯ ) রয়েছে যে, তিনি নবী করীম (সঃ) এর সাহাবা

হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তিনি সাধারণ স্তরের সাহাবাদের মধ্যে পরিগণিত। ইতিহাসের কিতাবসমূহে তাঁর অনেক ফযীলত ও গুণাগুণ উল্লেখ রয়েছে।

৭। আলী ইবনু আবি তালিব (রঃ)।

একজন জলীলুল রুদর সাহাবী, খুলাফায়ে রাশেদীনের একজন।

**রাবী ইবনু আবি সাবুরাহ (মঃ ১৬২ হিঃ) সম্পর্কে অস্পষ্ট সমালোচনাঃ**

ইমাম নাসাঈ বলেনঃ তাঁর বর্ণিত হাদীছ মাত্ররূক তথা পরিত্যাজ্য।

আব্দুল্লাহ এবং সালিহ স্বীয় পিতা ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হাদীছ জাল করতেন।

তবে একথাগুলো অতিশয়োক্তি থেকে মুক্ত নয়, কারণ হাদীছ শাস্ত্রবিদদের নিকট সর্বজনবিদিত একটি মূলনীতি এও আছে যে, একজন বর্ণনাকারী দোষ-ত্রুটির কারণ ও বিবরণ উল্লেখ ব্যতীত কেবল দোষ ত্রুটি বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। উপরন্তু উক্ত কারণ ও বিবরণ এর উপর প্রমাণও থাকতে হবে।

( দেখুনঃ الرفع والتكميل পৃ-৪১ )

এখানে জরাহ-তা 'দীল' শাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্পর্কে সবার অবগত হওয়া দরকার।

জরাহ এবং তা'দীল প্রত্যেকটি মূলত দুই প্রকার। জরহে মুবহাম (অস্পষ্ট সমালোচনা), জরহে মুফাসসার (ব্যাপক বিস্তৃত সমালোচনা), তা'দীলে মুবহাম (অস্পষ্ট স্বীকৃতি), তা'দীলে মুফাসসার (বিশদ সত্যয়ন ও স্বীকৃতি)।

মুবহাম বলতে সেই সব জরাহ-তা 'দীলকে বুঝায় যেগুলোতে জরাহ-তা 'দীলের কারণসমূহ বিবৃত হয়নি। পক্ষান্তরে যেখানে জরাহ-তা 'দীলের কারণসমূহ বিশদভাবে বিবৃত হয়ে থাকে, তাকে মুফাসসার বলা হয়। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সহ জরাহ তা'দীলের অধিকাংশ বিদ্বৎ ইমামগণের মতে, তা'দীলে মুবহামও গ্রহণযোগ্য। এতে এর কারণগুলো উল্লেখ করার কোন আবশ্যিকতা নেই। পক্ষান্তরে জরাহ যদি মুবহাম হয়, তার কোন গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। এক্ষেত্রে সমালোচনার কারণ সমূহ উল্লেখ থাকা একান্ত আবশ্যিক। খতীব বাগদাদী, হাফেজ ইবনুস সালাহ ও ইমাম নববী এই মতকে অন্যান্য মতামত থেকে অত্যধিক সঠিক ও সমধিক প্রসিদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেন এবং একে সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণের মতামত বলে উল্লেখ করেন।

( বিস্তারিত জানতে দেখুন - আল কিফায়াহ ফী উলূমির রেওয়ায়েহঃ পৃ-১০০ , ১০৮, ১০৯; মুকাদ্দিমায়ে ইবনুস সালাহঃ পৃ-১১৭ ; আত তাকরীবঃ পৃ-২০২ )

অর্থাৎ যখন কোন রাবী বা ব্যক্তি সম্পর্কে সমালোচনা করা হবে, তখন তা বিস্তারিত আকারে প্রমাণ সহকারে কারণ সহ উল্লেখ থাকতে হবে, নতুবা তা মুহাদ্দিসীনে কেরামের কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

আলী ইবনে আল মাদীনী এবং ইমাম নাসাঈ, যারা দুজনেই ইবনে আবি সবুরাহর কিছু শতক পরে এসেছেন, তারা বলেন যে, ইবনে আবি সবুরাহ "মাত্ররূকুল হাদীস" ছিলেন (যাঁর হাদীস বর্ণনা করা যাবে না, কারণ তিনি ঐটুকু যোগ্যতা রাখেন না।)

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এর পুত্র, আব্দুল্লাহ এবং সালিহ স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি হাদীস জাল করতেন।



ইবনে আদীও ইবনে আবি সবুরাহকে হাদীস জালকারী ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

কিন্তু, এ সমস্ত বক্তব্য তাদের নয় যারা ইবনে আবি সবুরাহ এর সমসাময়িক বড় বড় জ্ঞানী লোক ছিলেন, বরং তাদের মত যারা ইবনে আবি সবুরাহর অনেক যুগ পরে এসেছেন। তাছাড়া এই মতগুলো অতিরঞ্জিত বা অতিশয়োক্তি থেকেও মুক্ত নয়। কারণ এসব মুহাদ্দিসীদের কেউই তার দোষ ত্রুটির কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত লিখে যান নি এবং কোন প্রমাণও দিয়ে যান নি।

এমনকি, ইমাম বুখারী, উলূমিল হাদীস শাস্ত্রে তার সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং গভীর অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও ইবনে আবি সবুরাহ সম্পর্কে কোন ধরনের ব্যাখ্যা ছাড়াই সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেছেন। তিনি ইবনে আবি সবুরাহকে শুধুমাত্র যঈফ বলে উল্লেখ করেছেন। এটা তাই আরও ব্যাখ্যার দাবি রাখে। এটা হতে পারে যে, ইবনে আবি সবুরাহ কিছুটা দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন, যার ফলে তিনি ইমাম বুখারীর কাছে রাবীর যোগ্যতার যে মানদণ্ড আছে, সেটা পূর্ণ করতে পারেন নি। তাই, তাঁর এ মতটি রাবীর পদমর্যাদা এবং ন্যায়পরায়ণতা বা পূর্ণতার ক্ষেত্রে নয়; বরং ইমাম বুখারীর নিজের কঠোর মানদণ্ড অনুযায়ী রাবীর যে যোগ্যতা দরকার ছিল, শুধুমাত্র তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

ইমাম যাহাবী এ বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আকারে আলোচনা করেছেন।

যাই হোক না কেন, এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝে রাখা দরকার যে, হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা অনুযায়ী, একজন জাল হাদীস বানানো ব্যক্তি বা রাবী কখনই 'যঈফ' রাবীর তালিকাভুক্ত হতে পারে না।

ইমাম বাযযার এই হাদীসকে "লীন হাদীস" বলে যে মন্তব্য প্রদান করেছেন, তাও সম্পূর্ণ সঠিক নয়।

হাদীস তালিকাভুক্ত (কোন হাদীস কোন তালিকায় পড়বে) করার ক্ষেত্রে, হাদীস শাস্ত্রে "লীন হাদীস" এবং "ইয়াদা উল হাদীস" এই ২ টি গ্রুপের মাঝে বিশাল পার্থক্য বিদ্যমান।

( দেখুনঃ কাশফুল আসতার আন জাওয়াইদিল বাযযার )

কোন ভাবেই এই দাবী করা সঠিক হবে না যে, ইবনে আবি সবুরাহ জাল হাদীস রচনাকারী ছিলেন। যদি তাই হত, তাহলে ইমাম মালিক এবং অন্যান্য অসংখ্য প্রসিদ্ধ ফকীহর উপস্থিতিতে ইবনে আবি সবুরাহকে কখনোই মদীনা মুনাওয়ারাতে ইফতা তথা কাযীর পদের দায়িত্ব ও সুবিধা দেয়া হত না, এক কথায় সম্ভবও নয়।

ঠিক একই ভাবে, ইমাম মালিকের পক্ষে এটাও কখনও সম্ভব হত না যে, ঐ সময়ের পবিত্র নগরীর ৩ জন বুজুর্গ এবং প্রসিদ্ধ স্বীকৃত ব্যক্তির একজন হিসেবে তিনি ইবনে আবি সবুরাহর নাম উল্লেখ এবং প্রস্তাব করেছিলেন। খলিফা মনসুর যখন মদীনা মুনাওয়ারাতে কাযী পদের জন্য লোক খুঁজছিলেন তখন ইমাম মালিক এই প্রস্তাব করেছিলেন অন্য ২ জনের সাথে ইবনু আবি সবুরাহকে কাযী পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য।

( দেখুনঃ সিয়রু আলামিন নুবালা এবং তাহযীবুত তাহযীব; আরও দেখতে পারেনঃ মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানীর কিতাব লাইলাতুল বারাত )

তাছাড়াও, আহমদ ইবনে হাম্বল এবং ইবনে আদী বাদে, অন্য কোন মুহাদ্দিসীন তাদের আগে ইবনে আবি সবুরাহর সত্যবাদীতা বা মর্যাদার ব্যাপারে কোন মন্তব্য করেন নি। শুধুমাত্র ইমাম বুখারীর মন্তব্য পাওয়া যায় এবং তাঁর কঠোর মূলনীতি ও মানদণ্ডের আলোকে তিনি শুধুমাত্র এই মন্তব্যটিই করেছেন যে, ইবনে আবি সবুরাহ যঈফ। (হাদীসের মতন সম্পর্কেও কিছু বলা হয় নি)।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, সে (ইবনে আবি সবুরাহ) আহলুল মদীনার (মদীনার মানুষ) কাছে গ্রহণযোগ্য মুফতি ছিলেন।

হযরত মা'আন উল্লেখ করেন যে, আমিরুল মুমিনীন আবু জাফর আল মনসুর ইমাম মালিকের কাছে জানতে চান, " বড় বড় প্রসিদ্ধ মাশায়েখদের মধ্যে এখন কারা কারা বেঁচে আছেন? " তিনি (সাহিবুল মুতহ্ব) তাদের নাম পরপর উল্লেখ করে উত্তর দেন, বলেনঃ " ইবনে আবি তাঈব, ইবনে আবি সবুরাহ এবং ইবনে আবি সুলামাহ আল মাজিশুন বেঁচে আছেন এখন। "

এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মদীনা মুনাওয়ারাহ ইসলাম এবং খাইরুল কুরানের জমানার মুসলিমদের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। ইবনে আবি সবুরাহ প্রথমে ইরাকের একজন মুফতী এবং কাযী ছিলেন। এটা ছিল ইমাম আবু ইউসুফের নিয়োগের আগের কথা। অতঃপর, তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারাহর মুফতী এবং কাযী পদের সুবিধা (নিয়োগ) দেওয়া হয়।

এরকম একজন প্রসিদ্ধ, নামকরা, গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি কি কখনো সাদিক এবং আদিল ( সত্যবাদী এবং নির্ভরযোগ্য ) না হয়ে পারে ??

তিনি কি হাদীস জাল কারী হতে পারেন এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেন ?? যদি তাই হয়, তাহলে কাযীর মত গুরুত্বপূর্ণ পদে ইমাম মালিকের মত বুজুর্গ ও মুজতাহিদের উপস্থিতিতে এরকম ব্যক্তি কি কখনো নিয়োগ পেতে পারে ??

স্বয়ং ইমাম মালিক কি এই রকম ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ ও জন বুজুর্গের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ??

স্বয়ং ইমাম মালিক কি কাযী পদে নিয়োগ দানের জন্য এই রকম ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করতে পারেন ??

তাছাড়াও সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, এই রকম পদে কি একজন মিথ্যুক বা হাদীস জালকারী থাকতে পারেন, অথচ যেখানে প্রধান নীতি হচ্ছে একজন মুফতিকে আবশ্যিকীয়ভাবে আদিল (নির্ভরযোগ্য), সাদিক (সত্যবাদী) হতে হবে ??

এরকম মুফতিকে তো অভিজ্ঞ হতে হবে এবং কোরআন ও হাদীসের গভীর জ্ঞানও থাকতে হবে। সাথে সাথে, দ্বীনের মাসয়ালা মাসায়েল সঠিক ও পর্যাণ্ডভাবেও তাকে বুঝতে হবে, পরিবেশের ভিন্নতার প্রেক্ষিতেও দ্বীন ও মাসায়েলের পরিপূর্ণ ও সঠিক বুঝ থাকতে হবে। এগুলো হল ইফতা বা বিচারকার্যের প্রাথমিক মূলনীতি এবং আবশ্যিকতা।

আহলুল মদীনা এত অশিক্ষিত, অবুঝ, বিবেকহীন, বোকা, অবিবেচক, অপরিণামদর্শী ছিলেন না যে, ইমামুল মাতহ্ব এবং বড় বড় যুগবিখ্যাত ধার্মিক বুজুর্গানে দ্বীন যেমন মুজতাহিদ ইমাম মালিকের উপস্থিতিতে তারা এমন এক ব্যক্তিকে কাযী এবং মুফতি হিসেবে পছন্দ করবেন বা নিয়োগ দিবেন যে কিনা হাদীস জাল করত বা মিথ্যুক ছিল !!

তারা কি দ্বীনের মাসয়ালা মাসায়েলগত বিষয়াদির ক্ষেত্রে এবং ধর্মীয় বিধি বিধানের ক্ষেত্রে এমন একজনকে পছন্দ করতে পারেন যে হাদীস জালকারী ছিল ??

ইবনে আবি সবুরাহ হযরত আলী (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছের নিছক একজন রাবী মাত্র। তাছাড়া, এই মন্তব্যগুলো আলী (রঃ) এর হাদীসের মতন (বক্তব্য) এর উপর করা হয় নি। "যঈফ" শুধুমাত্র ইবনে আবি সবুরাহকেই বলা হয়েছে।

ইবনে আবি সবুরাহ প্রসিদ্ধ, বুজুর্গ, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যেমনঃ হযরত আতা ইবনে আবি রুবাহ ইমাম আরুজ এবং হিশাম ইবনে আবি ওরওয়াহ প্রভৃতি বুজুর্গদের ছাত্র ছিলেন এবং তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন।

তাছাড়াও, ইবনে আবি সবুরাহ, বিখ্যাত মুহাদ্দিস এবং হাদীসের উস্তাদ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ইবনুল হুইমাম এর উস্তাদ ছিলেন। আবার ইমাম আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন ইমাম বুখারীর উস্তাদ। পাশাপাশি ইমাম ইবনে জুওরাযী, ইমাম আবু আসিয়াম আন নাবিলেরও উস্তাদ ছিলেন।

( আরও দেখুনঃ তাহযীবুল কামাল )

যাই হোক না কেন, যারা ইবনু আবি সবুরাহকে "জাল হাদীস রচনাকারী বা যঈফ" বলেছেন, তাদের মধ্যে কেউই এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে যাননি, কিংবা কোন স্পষ্ট দলীল বা প্রমাণও দিয়ে যান নি। এমনকি আমাদের জ্ঞানের আওতায় এসব মুহাদ্দিসীনগণ ইবনে আবি সবুরাহ কর্তৃক সম্পৃক্ত এমন কোন হাদীসকেও মওযু (জাল) বলেন নি।

অথচ ইবনে আদী, ইবনে আবি সবুরাহর অনেক হাদীস নিয়েই আলোচনা করেছেন, কিন্তু তার একটি হাদীসও তিনি মওযু বলে চিহ্নিত করেন নি, কিংবা তার এসব কিতাব যেখানে তিনি মওযু হাদীসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেখানেও স্থান পায়নি। বাস্তব সত্য হল, ইবনে আদী যেসব হাদীস নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার প্রত্যেকটি হাদীসই অন্যান্য নির্ভরযোগ্য রাবীদের কাছ থেকেও বর্ণিত। যার ফলে, সেসব হাদীসগুলোও প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য রাবীদের কাছ থেকেই বর্ণিত। আর ইবনে আদী নিজেই ইবনে আবি সবুরাহর অনেক হাদীস নিয়ে আলোচনা করেছেন।

মুফতী তকী উসমানী লিখেছেনঃ হযরত আলী (রঃ) এর হাদীসটি সিহাহ সিত্তার একটি বিখ্যাত কিতাব সুনানে ইবনে মাজাহতে উল্লেখ আছে এবং ইমাম বায়হাকীর বিখ্যাত কিতাব শুয়াবুল ইমানেও উল্লেখ আছে। তাদের উভয়েই এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এর বিশুদ্ধতা নিয়ে কোন মন্তব্য করেন নি।

ইবনে আবি সবুরাহ নামক একজন রাবী থাকায় হাদীসের স্কলাররা তথা মুহাদ্দিসীনগণ এই হাদীসকে দুর্বল বা যঈফ বলেছেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, তিনি হাদীস জাল করতেন, তা সঠিক নয়। বাস্তব সত্য কথা হচ্ছে, তিনি মদীনার মুফতী ছিলেন; মনসুরের আমলে ইরাকের কাযী (বিচারক) হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন, তিনি ইমাম আবু ইউসুফের সাথে অত্যন্ত সফলও ছিলেন। তিনি ইমাম মালিকের সহযোগী ছিলেন।

একদা মনসুর, আব্বাসী খলিফা, ইমাম মালিকের কাছে ৩ জনের নাম জিজ্ঞেস করেন, ইমাম মালিক তার মধ্যে একজনের নাম বলেন ইবনে আবি সবুরাহ। তিনি যদি সত্যিকার অর্থেই হাদীস জালকারী হতেন, তাহলে ইমাম মালিক কখনোই তার নাম বলতেন না। তবে তার উচ্চ পদমর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তার স্মৃতিশক্তি কিছুটা কম থাকায়, অনেক ইমামগণ যেমন ইমাম বুখারী তার কিছুটা সমালোচনা করেছেন এবং তাকে যঈফ বলেছেন; কিন্তু তাকে জাল হাদীস রচনাকারী কিংবা মিথ্যুক ঘোষণা করেন নি।

ইমাম আহমদ তাকে মিথ্যুক ও হাদীস জালকারী বলেছেন। কিন্তু তার এই মন্তব্য একজনকে হাদীস জালকারী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। কারণঃ

প্রথমত, ইমাম আহমদ ইবনে আবি সবুরাহর অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ইবনে আবি সবুরাহর সমসাময়িক কোন বুজুর্গ বা মুহাদ্দিস তার সম্পর্কে এ মত পোষণ করেন নি।

আর দ্বিতীয়ত, যে আরবী শব্দটি ইমাম আহমদ ব্যবহার করেছেন, তা মাঝে মাঝে এক রেওয়াজেতের সাথে আরেক রেওয়াজেতের মাঝে অসমঞ্জস্যতা বা বিশৃংখলা (confusion) ইত্যাদি বুঝাতে ব্যবহৃত হয়, কাউকে মিথ্যাবাদী বা হাদীস জালকারী সাব্যস্ত করার জন্য নয়।

এই কারণে অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনগণ আবু বকর ইবনে আবি সবুরাহকে দুর্বল রাবী হিসেবে সনাক্ত করেছেন হাদীস জালকারী হিসেবে নয়।

পূর্ব যুগের মুহাদ্দিসীনদের মণ্ডু হাদীস নিয়ে বিশাল বিশাল অনেক কিতাবই রয়েছে কিন্তু এই হাদীসটি সেসব কিতাবের কোনটিতেই স্থান পায়নি।

এমনকি এটা সবার জানা কথা যে, ইবনে মাজাহ নিজেই প্রায় ২০ টি হাদীসকে মণ্ডু বা জাল হিসেবে সনাক্ত করেছেন। এই হাদীসের তালিকাগুলো এখনও বিদ্যমান, কিন্তু সেখানেও ইবনে মাজাহ তার সুনানে উল্লেখিত এই হাদীসটিকে স্থান দেন নি। অতএব, এই হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা এই যে, হাদীসটি মণ্ডু বা জাল নয়, শুধুমাত্র দুর্বল।

মোদ্দা কথা হল, যারা ইবনু আবি সবুরাহকে জাল হাদীস রচনাকারী বলেছেন তারা কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন নি। الرفع والتكميل পৃ-৪১ কিতাবে কথাটি এভাবে বলা হয়েছেঃ

“ ইবনু আবি সবুরাহ মাতরুফুল হাদীছ কিংবা জাল হাদীছ রচনাকারী হওয়ার ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের কেউই বিস্তারিত কারণসহ বিবরণ দেন নি। ”

তাহাড়া হাফিয় যাহাবী তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে এভাবে শুরু করেনঃ মহান ফকীহ ইরাকের কাজী, আবু বকর ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আবি সাবুরাহ

ইমাম আবু দাউদ বলেনঃ তিনি মদীনাবাসীর মুফতী ছিলেন। (المدينة مفتى)

ইমাম বুখারী (রহঃ) তাকে যঈফ ছাড়া অধিক কিছু বলেন নি।

হাফিয় শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন , তাঁর স্মৃতিশক্তি দুর্বল বিধায় তিনি হাদীছশাস্ত্রে দুর্বল। মূলত এটাই বিশুদ্ধ এবং চূড়ান্ত রায়।

### হাদীছটির অবস্থানঃ

উল্লেখিত বিবরণ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত হাদীছটিতে “ ابن أبي سبره ” ইবনু আবি সবুরাহ নামে জনৈক রাবী ব্যতীত অন্যান্য সকল রাবী নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত। সুতরাং হাদীছটিকে বড় জোর যঈফ বলা যেতে পারে। কোন কোন মুহাদ্দিস ইবনু আবি সবুরাহকে জাল হাদীছ রচনাকারী বলেছেন বিধায় হাদীছটিকে জাল বলা যাবে না। কারণ তিনি জাল হাদীছ রচনাকারী – কথাটি সঠিক নয়। তাঁর সম্পর্কে বিশুদ্ধ ও চূড়ান্ত রায় সেটাই যা হাফিয় যাহাবী সূত্রে আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, স্মৃতি শক্তির দুর্বলতার কারণে তিনি যঈফ রাবী ছিলেন।

এই কারণেই ইমাম যুরকানী হাদীছটি সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, যদিও তার সনদ দুর্বল কিন্তু তার রাবীগণ মিথ্যুক নন, কিংবা জাল রচনাকারী নন। সর্বোপরি তার সমর্থনে আরো হাদীছ পাওয়া যায় বিধায় হাদীছটির ভিত্তি রয়েছে।

যেমন শারহুল মাওয়াহিবিল লাদুনিয়া (৭/৩১২) তে এসেছেঃ

সুনানে ইবনু মাজাতে আলী (রঃ) থেকে মারুফ হিসেবে যঈফ সনদ দ্বারা হাদীছটি উল্লেখ হয়েছে তেমনিভাবে আল মুনিযীরী ও হাফিয় আল ইরাকী তাঁর দুর্বলতার কারণ উল্লেখ করতঃ নিশ্চয়তার সাথে বলেছেন কিন্তু হাদীছটির মধ্যে কোন মিথ্যুক ও জাল হাদীছ রচনাকারী নেই এবং তার সমর্থনে আরো হাদীছ আছে যা তার ভিত্তি আছে বলে প্রমাণ করে।

অনুরূপ ভাবে আল্লামা ইরাকীও হাদীছটিকে দুর্বল বলেছেন ঠিক কিন্তু জাল বলেন নি তাঁর ভাষায়ঃ

“ শবে বরাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কীয় যে হাদীছ আলী (রঃ) সূত্রে ইবনু মাজাহতে রয়েছে তার সনদ দুর্বল। ”

মোট কথা, হাদীছটি একজন রাবীর কারণে দুর্বল তবে তার ভিত্তি রয়েছে অন্যান্য হাদীছের সমর্থন পাওয়া যাওয়ায় তার উপর আমল করা যাবে।

সার কথাঃ

ইবনু আবি সবারাহ নামক একজন রাবী থাকায় আহলে হাদীস/সালাফীদের কিছু আলেম হযরত আলী (রঃ) এর এই হাদীসটিকে জাল বলার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু কথাটি সঠিক নয়। হাদীসটি শুধুমাত্র দুর্বল। এ কারণেই আল্লামা ইরাকী, ইমাম আল মুনিযীরী, ইমাম যুরকানীর মত বিজ্ঞ মুহাদ্দিসরা এই হাদীসটি জাল বলেন নি, শুধুমাত্র দুর্বল বলেছেন। অনেক বড় বড় বুজুর্গরা এই হাদীসটি তাদের কিতাবে উল্লেখ করেছেন এবং এর উপর আমল করা যাবে বলে মত প্রকাশ করেছেন। যেহেতু হাদীস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী কোন রাবীর সমালোচনা গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শুধুমাত্র দুর্বল বা মিথ্যক, এতটুকু উল্লেখ থাকলেই হয় না, বরং এর স্বপক্ষে কারণসহ পর্যাপ্ত পরিমাণ দলীল-প্রমাণাদি থাকা আবশ্যিক, সেহেতু যারা এই রাবীকে মিথ্যক বা জাল হাদীস রচনাকারী বলে থাকেন, তারা দয়া করে প্রমাণ দেখিয়ে যাবেন কেন তিনি মিথ্যক বা জাল হাদীস রচনাকারী।

পর্ব ১৮

হাদীছের আলোকে শবে বরাত - ১০

গত কয়েক পর্বে আমরা শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কিত মোট এগারটি হাদীস উল্লেখ করে সেগুলোর কয়েকটিকে সহীহ বা হাসান প্রমাণ করেছিলাম। যদি শবে বরাতের ফযীলতের ব্যাপারে আর কোন হাদীস না থাকত, তবে এই হাদীসগুলোই এ রাতের ফযীলত সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এবং এ রাতে মাগফেরাতের উপযোগী নেক আমলের গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার জন্য যথেষ্ট হত।

এই পর্বে আমরা আরও একটি হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করব এবং সাথে সাথে এই হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসীদের মতামত পর্যালোচনা করব।

দ্বাদশ হাদীছ(حديث ضعيف)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, পাঁচটি রাত এমন আছে যে রাতগুলোতে দু'আ ফেরত দেয়া হয় না। জুমআর রাত, রজবের প্রথম রাত, শাবানের পনের তারিখ এর রাত এবং দু'ঈদের রাতে।

উক্ত হাদীছটি

১। হাফেয আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসনাদে

২। ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে

রাবী পর্যালোচনা ও হাদীছটির অবস্থানঃ



হাফিয আব্দুর রাজ্জাক উক্ত হাদীছটি একজন অজ্ঞাত উস্তাদ থেকে তিনি ইবনুল বীলমানী এবং তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন।

১। তাঁর সরাসরি উস্তাদ অজ্ঞাত, অপরিচিত।

ইবনু বীলমানী এবং তাঁর পিতা সম্পর্কে মুহাদ্দিছদের মন্তব্য নিয়ে প্রদত্ত হলো।

২। মুহাম্মদ ইবনু আবদির রহমান আল বীলমানী।

তাঁর সম্পর্কে ইমাম দারাকুতনী বলেনঃ তিনি একজন দুর্বল রাবী।

হাফিয যাহাবী বলেনঃ মুহাদ্দিছগণ তাঁকে যঈফ বলেছেন।

হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি সপ্তম স্তরের একজন যঈফ রাবী।

( দেখুনঃ تفريب التهذيب ২-খ, পৃ-১০৩ )

৩। আব্দুর রহমান আল বীলমানী।

ইমাম দারাকুতনী বলেনঃ

ضعيف لا تقوم به حجة

তিনি একজন দুর্বল রাবী। তাঁর হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা যাবে না।

( তাকরীবুত তাহযীবঃ ১-খ, পৃ-৫৬৩ )

ইমাম আবু হাতিম বলেনঃ তিনি " لين " অনির্ভরযোগ্য রাবী।

হাফিয ইবনু হাজার বলেনঃ তিনি তৃতীয় স্তরের একজন দুর্বল রাবী।

সুতরাং সনদের দিক দিয়ে হাদীছটি দুর্বল হলেও ফাযায়েলের ক্ষেত্রে এরূপ হাদীছ গ্রহণযোগ্য। এ ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই।

**উপরোক্ত বারটি হাদীছ সম্পর্কে আলোচনার নির্যাসঃ**

এ সকল হাদীছের বিস্তারিত আলোচনা দ্বারা একথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, শবে বরাত সম্পর্কীয় হাদীছগুলো সূত্রের দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তরের। কিছু হাদীছ হাসান (حسن) কিছু হাদীছ মুরসাল (مرسل) এবং কিছু হাদীছ যঈফ (ضعيف) স্তরের। কিন্তু এসব হাদীছকে সমষ্টিগত মিলালে হাদীছ শাস্ত্রের উসূল ও মূলনীতি অনুযায়ী হাদীছগুলো সহীহ কিংবা হাসান-এর (যা সহীহ'ই বটে) স্তরে উন্নীত হয়। আর এর দ্বারাই শবে বরাতের ভিত্তি ও ফযীলতের প্রমাণ মিলে। যা হঠকারিতা ছাড়া অন্য কোনভাবে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। মুহাদ্দিছগণ যদিও কোন কোন হাদীছের দোষ ত্রুটি আলোকপাত করেছেন কিন্তু কেউ সেগুলোকে ভিত্তিহীন জাল হাদীছ বা অগ্রহণযোগ্য হাদীছ বলেন নি। যেহেতু প্রতিটি হাদীছ পরস্পর পরস্পরের জন্য সহযোগী স্বরূপ, সেহেতু মুহাদ্দিছীনে কেরামের সমালোচনামূলক এজাতীয় হাদীছ প্রমাণের জন্য কখনো অন্তরায় হতে পারে না। সর্বোপরি হাদীছগুলো যেহেতু ফাযাইলে আমাল এর সাথে সংশ্লিষ্ট তাই হাদীছ শাস্ত্রের মূলনীতির দৃষ্টিকোণে এ বিষয়ে উদারতা প্রদর্শনের অবকাশ আছে এবং এর উপর আমল করার ক্ষেত্রে অমান্য



## করার কোন সুযোগ নেই।

অতএব উল্লেখিত বিস্তারিত পর্যালোচনার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শবে বরাতের সংশ্লিষ্ট এসব হাদীছ সহীহ। কিংবা অন্তত হাসান যা দলীল হিসেবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। এর পরেও কেউ যদি চোখ বন্ধ করে বলে দেয় যে, শবে বরাতের হাদীছগুলো মওজু বা জাল কিংবা নিতান্তই দুর্বল অথবা এ উক্তি করে বসে যে, শবে বরাতের ফজীলতের কোন ভিত্তি নেই। তাহলে সে ব্যক্তি হাদীছ ও হাদীছের মূলনীতি সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ, সরাসরি স্পষ্ট ভুলে লিপ্ত এবং এ ধরনের উক্তি সহীহ ও হাসান হাদীছকে নয় শুধু বরং পুরো হাদীছশাস্ত্রকে অস্বীকার করারই নামান্তর।

শবেবরাতের হাদীছগুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিছীনে কেরামের অগ্রগণ্য ও চূড়ান্ত অভিমতঃ

প্রথম অভিমতঃ আল্লামা মুবারকপুরী

একারণেই হাফিয মুহাম্মদ আব্দুর রহমান ইবনু আদ্রির রহিম আল মুবারকপুরী বলেছেনঃ

" জেনে রাখো যে, শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের হাদীছ এসেছে। যার ফলে শরীয়তে তার ভিত্তি আছে বলে বুঝা যায়। তন্মধ্যে থেকে আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীছ এবং আয়শা (রঃ) এর হাদীছ, মুআয (রঃ) এর হাদীছ, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রঃ) এর হাদীছ এবং আলী (রঃ) এর হাদীছ। সুতরাং এসব হাদীছের সমষ্টি তাদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণস্বরূপ যারা শরীয়তের মধ্যে শবে বরাতের কোন ভিত্তি নেই বলে মনে করে। "

( তুহফাতুল আহওয়াজীঃ খ-৩ , পৃ-৪৪২ , ১৩৫৩, দারুল ফিকির )

দ্বিতীয় অভিমতঃ আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ)

মুহাদ্দিছুল আসর আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেনঃ

" এ রাতটি বরাতের রাত। রাতটির ফজীলত সম্পর্কে সহীহ হাদীছসমূহে এসেছে। "

( আলারফুস শাযীঃ পৃ-১৫৬ )

তৃতীয় অভিমতঃ নাসির উদ্দীন আলবানী

নাসিরুদ্দীন আলবানী শবে বরাত সম্পর্কীয় সকল হাদীছ এক সাথে করে সেগুলোর সনদ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেছেন এবং পর্যালোচনার শেষে তার সার নির্যাস পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেছেন এভাবেঃ

" সারকথা হলো এ সকল সূত্রের সমষ্টির কারণে (শবে বরাত সম্পর্কীয়) হাদীছ নিঃসন্দেহে সহীহ। কোন হাদীছ অত্যধিক দুর্বলতা থেকে নিরাপদ হলে এর চেয়ে কম সূত্রের মাধ্যমে সহীহ প্রমাণিত হয়। যেমনটি আয়শা (রঃ) এর বর্ণিত হাদীছটি যা অত্যধিক দুর্বলতা থেকে নিরাপদ। সুতরাং কাসেমী হাদীছ পর্যালোচক ও সমালোচকদের থেকে নকল ইসলাহুল মাসাজিদ গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন যে, শবে বরাতের ফযীলত সম্পর্কে কোন সহীহ হাদীছ নেই। তার এ কথার উপর আস্থা রাখা উচিত নয়। "

( সিলসিলাতুল আহাদিসা সহীহাঃ খ-৩ , পৃ- ১৮৩ )

চতুর্থ অভিমতঃ শাইখ শূয়াইব আল আরনাউত

সময়কালীন বিশিষ্ট হাদীছ পর্যালোচক শাইখ শুয়াইব আল আর নাউতমুসনাদে আহমদের টীকায় আব্দুল্লাহ বিন আমর (রঃ) কর্তৃক শবে বরাতের হাদীছটির উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেনঃ

" হাদীছটি তার সহযোগী হাদীছগুলো দ্বারা সহীহ বলে বিবেচিত। সহযোগী হাদীছগুলো হচ্ছে

- ১। আয়শা (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ
- ২। মুআয বিন জাবাল (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ
- ৩। আবু মূসা আল আশআরী (রঃ) এর হাদীছ
- ৪। আবু বকর (রঃ) এর হাদীছ
- ৫। আবু ছালাবাহ আল খুশানী (রঃ) এর হাদীছ
- ৬। আবু হুরায়রা (রঃ) এর হাদীছ
- ৭। আউফ বিন মালিক এর হাদীছ

এ সকল সহায়ক বা সমর্থক হাদীছের প্রত্যেকটির সূত্রের মধ্যে যদিও কিছু অসুবিধা আছে তবে এসব হাদীছের সমষ্টি দ্বারা মূল হাদীছ সহীহ ও শক্তিশালী বলে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং কাসেমী (রহঃ) হাদীছ পর্যালোচক ও সমালোচকদের থেকে ইসলামুল মাসাজিদ গ্রন্থে যা উল্লেখ করেছেন যে, মধ্য শাবানের রাতের ফজীলত সম্পর্কে সহীহ হাদীছ নেই এর অর্থ হলো এ ব্যাপারে কোন হাদীছ সহীহ সূত্রে প্রমাণিত নেই। কিন্তু সবগুলো হাদীছের সমষ্টিগত সূত্রের দ্বারা হাদীছগুলো পরস্পরে শক্তিশালী ও মজবুত হয়ে বিষয়টি প্রমাণিত এতে কোন সন্দেহ নেই। "

( মুসনাদে আহমদঃ খ-১১ , পৃ-১৬ , ৬৬৪২ )

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া বলেনঃ

" এ রাতের ফজীলতে বেশ কিছু মরফু হাদীস এবং আছার বর্ণিত আছে যে প্রমাণ করে যে এ রাতটি ফজীলতপূর্ণ। পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ এ রাতে বিশেষভাবে সালাত আদায় করতেনা ... যে মতের উপর আমাদের মাযহাবের বা অন্যান্য মাযহাবের বহু সংখ্যক বরং বেশিরভাগ আলেমরয়েছেন তা হলো এই রাতটি অন্যান্য রাতের উপর ফজীলত রাখো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর স্পষ্ট কথার মাধ্যমে এটিই জানা যায়। আর যেহেতু এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের আমল সেসকল হাদীসকে সত্য্যন করে। "

( ইক্তিদাউস সিরাত আল মুস্তাকিম )

আহলে হাদীস/সালাফী ভাইদের কাছে প্রশ্ন ও দাওয়াতঃ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, আহলে হাদীস বা সালাফীদের সবচেয়ে গণ্যমান্য ইমাম শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া শবে বরাতের ফজীলতকে স্বীকার করেছেন এবং এ রাতে সলফে সালাহীনরা ইবাদত করেছেন বলেও উল্লেখ করেছেন।

অন্যদিকে হাদীসের তাহকিক তথা বিচার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সালাফী/আহলে হাদীছ ভাইরা যার সবচেয়ে বেশি ভক্ত, যার কিতবাদি অনুবাদ করে আপনারা প্রচার করে থাকেন, সময়কালের বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ নাসিরউদ্দীন আলবানীও (রহঃ) শবে বরাতের ফজীলত সম্পর্কিত সহীহ হাদীস আছে বলে উল্লেখ করেছেন এবং যারা বলে থাকেন শবে বরাত সম্পর্কিত কোন সহীহ হাদীস নেই, তাদের মতকে ভুলও বলেছেন।

নাসিরউদ্দীন আলবানীর অন্যতম শিষ্য শায়খ শুয়াইব আল আরনাউত এবং আহলে হাদীসের অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা মুবারকপুরীও শবে বরাতে ফজীলতের ভিত্তি আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

তাই আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন তাহলে কেন আপনারা বার বার বলেন যে, শবে বরাতে ফযীলত নিয়ে কোন সহীহ হাদীস বা হাসান হাদীসও বর্ণিত নেই??

সালাফী বা আহলের হাদীসের ঐসব বন্ধুদের প্রতি দাওয়াত রইল, আপনারা আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ), শায়খ আলবানী (রহঃ) এর গবেষণা ও সিদ্ধান্ত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন আমি ওই সব ভাইদের কাছে বিনীতভাবে আরজ করতে চাই যে, আপনারা যদি শায়খ ইবনে বাযের (রহঃ) অনুসরণে বা নিজেদের তাহকীক মতো এই রাতের ফযীলতকে অস্বীকার করতে পারেন তাহলে যারা উপরোক্ত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের অনুসরণে উল্লেখিত হাদীসটির ভিত্তিতে এই রাতের ফযীলতের বিশ্বাস পোষণ করেন এবং সব ধরনের বেদআত রসম-রেওয়াজ পরিহার করে নেক আমলে মগ্ন থাকার চেষ্টা করেন তারাই এমন কি অপরাধ করে বসলেন যে, আপনাদেরকে তাদের পেছনে লেগে থাকতে হবে? এবং এখানকার উলামায়ে কেরামের দলীলভিত্তিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে অন্য একটি মত যা ভুলের সম্ভাবনার উর্ধ্বে নয়, তা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে আলেম-উলামার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আস্থাহীন করা এবং বাতিলপন্থিদের মিশন সফল করতে সহায়তা দেওয়া কি সত্যিকার অর্থেই খুব বেশি প্রয়োজন? এতে তো কোন সন্দেহ নেই যে, আপনারা আপনাদের মতটিকে খুব বেশি হলে একটি ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনায়ুক্তই মনে করেন এবং নিশ্চয়ই আপনারা আপনাদের মতটিকে একেবারে ওহীর মতো মনে করেন না। একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, এরপর আপনাদের এই অবস্থানের যৌক্তিক কোন ব্যাখ্যা আর থাকে কি না?

আপনাদের প্রতি আমার সর্বশেষ অনুরোধ এই যে, দয়া করে এ রাতের ফযীলত ও আমল সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) [মৃ. ৭২৮ হিঃ] এর ইক্তিযাউস সিরাতিল মুস্তাকিম/৬৩১-৬৪১ এবং ইমাম যায়নুদ্দীন ইবনে রজব (রহঃ) [মৃ. ৭৯৫] এর লাতায়েফুল মাআরেফ ১৫১-১৫৭ পড়ুন এবং ভেবে দেখুন যে, তাদের এই দলীলনির্ভর তাহকীক অনুসরণযোগ্য, না শায়খ ইবনে বায (রহঃ) এর একটি আবেগপ্রসূত মতামত? যা হয়ত তিনি শবে বরাত নিয়ে জাহেল লোকদের বাড়াবাড়ির প্রতিকার হিসেবেই ব্যক্ত করেছেন কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, বাড়াবাড়ির প্রতিকার কোন বাস্তব সত্য অস্বীকার করে নষ্ট বরং সত্য বিষয়টির যথাযথ উপস্থাপনের মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

পর্ব ১৯

হাদীছের আলোকে শবেবরাতের ফজীলত ও আমলসমূহঃ

ইতিপূর্বে শবেবরাতের শরয়ী প্রমাণ সম্পর্কে বারটি হাদীছ এবং এর সূত্র বা সনদ ও তার পর্যালোচনা সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। এ পরিচ্ছেদে আমরা শবেবরাতের মাহাত্ম্য, বৈশিষ্ট্য, ফজীলত ও আমলসমূহ যা পবিত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সেগুলো সংক্ষেপে পেশ করা হচ্ছে।

এ রাতে হায়াত-মউত ও বার্ষিক বাজেটের ফয়সালা হয়ঃ

হযরত আয়েশা (রঃ) হযরত নবী (সঃ) থেকে বর্ণনা করেনঃ

শবে বরাতে কি ঘটে এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রঃ) রসূল (সঃ) থেকে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই রাতের কার্যক্রম হলো এই বছর যত (সন্তান) জন্মগ্রহণ করবে তা লিপিবদ্ধ করা হয়। আর এই বছর যত (লোক) ইন্তেকাল করবে তা লিখা হয়। আর এই রাতেই বান্দাদের (সারা বছরের) কার্যাবলী (আসমানে) উঠানো হয় আর এই রাতেই নির্ধারিত রিযিক অবতীর্ণ হয়। তারপর আয়েশা (রঃ) জানতে চাইলেন যে হুজুর !

আল্লাহর রহমত ও করুণা ছাড়া কেউ কি বেহেশতে যেতে পারবে? রসূল (সঃ) তিনবার বলেনঃ কখনো পারবে না। আয়েশা (রঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ হুজুর ! আপনিও না? জবাবে বললেনঃ আমিও একমাত্র তার দয়া ও রহমত ছাড়া জান্নাতে যেতে পারবো না (তিনবার বললেন)।

( মিশকাত শরীফ )

হযরত আতা বিন ইয়াসির (রঃ) হতে বর্ণিতঃ

যখন শাবানের পঞ্চদশ রজনী আগত হয়, তখন আল্লাহর পক্ষ হতে মালাকুল মউতকে একটা তালিকা দেয়া হয় এবং হুকুম করা হয় যে, এই তালিকায় যেসব মানুষের নাম লিপিবদ্ধ আছে তাদের প্রাণ হরণ কর। কোন বান্দা বাগিচায় গাছপালা লাগাচ্ছে, কেউ বিবাহ করছে, কেউ বা নির্মাণ কাজে ব্যস্ত আছে অথচ তার নাম মৃতদের তালিকায় লেখা হয়ে গেছে।

( দেখুনঃ মুসান্নাফে আব্দুর রায়যাকঃ খ - ৪ , পৃ - ৩২৭ )

**শবে বরাতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাঃ**

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রঃ), মুআয বিন জাবাল (রঃ), আমর বিন আস (রঃ), আবু মূসা আশআরী (রঃ), আবু হুরায়রা (রঃ), আউফ বিন মালেক (রঃ), কাছীর বিন মুররাহ (রঃ) সহ বহু সাহাবায়ে কেরাম থেকে ইতিপূর্বে যে সব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে প্রায় সবগুলোর সারাংশ হলোঃ

নবী করীম (সঃ) ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা শাবানের পনেরতম রাতে প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং এই রজনীতে সকলকে ক্ষমা ও মাগফিরাত করে দেন কেবল মাত্র মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত।

( দেখুন ইতিপূর্বে উল্লেখিত হাদীছ সমূহ )

**অগণিত মুসলমানকে ক্ষমা করা হয় এ রাতেঃ**

ইতিপূর্বে উল্লেখিত ৪ নং হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আয়েশা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যার একাংশ হলোঃ

রসূল (সঃ) বলেনঃ নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ তাআলা শাবানের পনেরতম রজনীতে প্রথম আসমানে শুভাগমন করেন এবং কালব গোত্রের বকরীগুলোর পশম পরিমাণ মানুষকে ক্ষমা ও মাগফিরাত করে দেন।

( তিরমিযী )

**সূর্যাস্ত থেকে সকাল পর্যন্ত পুরস্কার দেয়ার ঘোষণাঃ**

ইতিপূর্বে উল্লেখিত ১১ নং হাদীছে হযরত আলী (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে দেখা যায় যে, অন্যান্য রজনীতে রাতের শেষাংশে গুনাহ মাফের আহবান করা হয় কিন্তু শবে বরাতের বৈশিষ্ট্য যে, সূর্যাস্ত থেকে সারারাতব্যাপী এ আহবান বলবৎ থাকেঃ

হযরত রসূল (সঃ) ইরশাদ করেন, যখন শাবানের পঞ্চদশ রজনী আগত হয় তখন রাতে নামায পড় এবং পরবর্তী দিনে রোযা রাখ। কেননা সূর্যাস্ত হওয়ার সময় হতে সুবহে সাদিক (ফযর) উদিত হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা প্রথম আসমানে অবতরণ করেন এবং এ আহবান করতে থাকেনঃ আছে কি কোন ক্ষমাপ্রার্থী আমি

তাকে ক্ষমা করে দেব? আছে কি কোন রিযিক যাচনাকারী, আমি তাকে রিযিক দেব? আছে কি কোন বিপদগ্রস্ত, আমি তাকে বিপদ হতে পরিত্রাণ দেব? আছে কি কোন এমন কেউ, এমন কেউ ইত্যাদি।

( ইবনে মাজাহ, বায়হাকী )

### শবেবরাতে রাত জাগরণের নির্দেশঃ

হযরত আলী (রঃ) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শাবানের পঞ্চদশ রজনীতে জাগ্রত থেকে অধিক হতে অধিক ইবাদত করাও মুস্তাহাব, রাত জেগে নফল নামায আদায় করুন, কুরআন তিলাওয়াত করুন, দুআ ও ইস্তিগফার করুন।

এ কারণে হাদীছ গবেষণা করলে দেখা যায় শবেবরাতে স্বয়ং রসূল (সঃ)ও রাত জাগরণ করেছেন অন্যদেরকেও রাত জাগরণের নির্দেশ দিয়েছেন বরং রাত জাগরণের ফযীলতও বর্ণনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে রসূল (সঃ) ইরশাদ করেনঃ

যে ব্যক্তি পাঁচটি রাতে জাগ্রত থাকবে তাঁর জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যাবে। ১. যিলহজ্জের অষ্টম রাত ২. যিলহজ্জের নবম রাত ৩. ঈদুল আজহার রাত ৪. ঈদুল ফিতরের রাত ৫. শাবানের পঞ্চদশ রজনী।

( মুনিযরী রচিত তারগীব ওয়াত তারহীবঃ খ-২ , পৃ-১৫২ )

এ কারণেই ফিকহের ইমামগণের অনেকে শাবানের পঞ্চদশ রাতে জাগরণ থাকাকে মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করেছেন। (যার বিবরণ পরবর্তীতে দেয়া হবে)

হযরত ইবনে উমর (রঃ) হতে বর্ণিত আছেঃ

হযরত ইবনে ওমর (রঃ) বলেনঃ পাঁচটি রজনীতে দুআ করা হলে তা কখনো ফেরত দেয়া হয় না (অবশ্যই ক্ববুল হয়) জুমআর রাত, রজবের প্রথম রাত, শাবানের পঞ্চদশ রাত এবং দুই ঈদের রাত।

( ইমাম বায়হাকী তাঁর শুয়াবুল ঈমানে; আব্দুর রাজ্জাক তাঁর মুসনাদে )

### মাছে শাবান এবং শাবানের পঞ্চদশে রোযা রাখার গুরুত্বঃ

হযরত আব্দুল্লাহ বিন কায়েস (রহঃ) হযরত আয়েশা (রঃ) হতে বর্ণনা করেনঃ

" রসূল (সঃ) এর নিকট নফল রোযার জন্য অন্যান্য মাসের তুলনায় শাবান মাস ছিল অত্যন্ত প্রিয়। অতঃপর তিনি শাবানের রোযাকে রমজানের সাথে মিলিয়ে দেয়াকে আরও বেশী পছন্দ করতেন। "

( আবু দাউদ )

হযরত উসামাহ বিন যাইদ (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত উসামা (রঃ) বলেন, হে আল্লাহর রসূল (সঃ), আমি আপনাকে রমজান ছাড়া এ পরিমাণ রোজা রাখতে অন্য কোন মাসে দেখিনি। যে পরিমাণ শাবান মাসে রাখেন। (উত্তরে) রসূল (সঃ) ফরমান, এটি রজব ও রমজানের মধ্যবর্তী একটি মাস, যে মাসের ফজীলত থেকে মানুষ বঞ্চিত থাকে। অথচ এ মাসে মানুষের আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। আমি রোজা অবস্থায় আমার আমল পেশ করাকে পছন্দ করি বিধায় রোজা রাখছি।

( নাসায়ী শরীফ )

তিনি বলেন, রসূল (সঃ) শাবান মাসের তুলনায় অন্য কোন মাসে এত বেশী (নফল) রোযা রাখতেন না। তিনি পূর্ণ শাবান বর্ণনান্তরে কিছু দিন ব্যতীত পুরো শাবানে রোযা রাখতেন।

( বুখারী ও মুসলিম )

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূল (সঃ) শাবান মাসে বেশী বেশী রোযা রাখতেন তাই হুজুরের উম্মত হয়ে আমাদেরও এই মাসে বেশী বেশী রোযা রাখা দরকার তবে শাবান ২৭, ২৮, ২৯ এ তিন দিন রোযা সঙ্গত কারণে রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

অন্য হাদীছে বর্ণিত আছে যে, প্রত্যেক মাসে ১৩, ১৪, ১৫ এ তিন দিন রোযা রাখার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমনঃ

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আস (রঃ) বলেনঃ রসূল (সঃ) ইরশাদ করেনঃ প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা রাখা পুরো বছর রোযা রাখার সমতুল্য।

( বুখারী ও মুসলিম )

আবু দাউদ শরীফে হযরত কাতাদাহ (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

রসূল (সঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আইয়ামে বীজের রোযা রাখতে (আর তা হল প্রত্যেক মাসের) তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখের রোযা।

( আবু দাউদ, নাসাঈ, সূত্র সহীহ )

এ হাদীছদ্বয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হয়, প্রত্যেক মাসের ১৫ তারিখ রোযা রাখার নির্দেশ সহীহ হাদীছে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। শাবানের পঞ্চদশ দিনে রোযা রাখা অত্যন্ত ছাওয়াবের কারণ। তদুপরি আমরা ইবনে মাজা শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে হযরত আলী (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি যে, শাবানের পনের তারিখ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত কর এবং দিনের বেলা রোযা রাখ। এ হাদীছটি সুস্পষ্ট নির্দিষ্ট শাবানের পঞ্চদশ দিনের রোযা রাখার ব্যাপারে বর্ণিত।

উল্লেখ্য যে, পূর্বে এ হাদীছের পর্যালোচনায় বলা হয়েছিল যে, হাদীছটি জাল কিংবা অত্যাধিক দুর্বল নয়। শুধু রাবীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে হাদীছটিকে কিছুটা দুর্বল বলা হয়েছে। আর কোন আমলের ফযীলত প্রমাণে এ ধরনের হাদীছ সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণযোগ্য। এর কারণে ফকীহগণ শাবানের পঞ্চদশ দিবসে রোযা রাখাকে মুস্তাহাব বলে সাব্যস্ত করেছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ।

**শবে বরাতে রসূলের দীর্ঘ সিজদায় নফল নামায আদায়ঃ**

ইমাম বাইহাকী (রহঃ) স্বীয় গ্রন্থ শুআআবুল ঈমানে আলা ইবনে হারেস (রহঃ) সূত্রে বর্ণনা করেনঃ

হযরত আলা ইবনে হারেস (রহঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত আয়েশা (রঃ) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সঃ) রাতে উঠে নামায পড়তে আরম্ভ করলেন এবং এত দীর্ঘ সিজদা করলেন, আমার এ ধারণা হলো যে, তাঁর ওফাত হয়ে গিয়েছে। আমি এ অবস্থা দেখে উঠে গেলাম এবং তার পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নাড়া দিলাম। সেটা নড়ে উঠল। (তখন) আমি ফিরে আসলাম যখন তিনি সেজদা হতে মাথা উঠালেন এবং নামায হতে অবসর হলেন, তখন



বললেনঃ হে আয়েশা! অথবা হে হুমায়রা! তুমি কি এ ধারণা পোষণ কর যে, (আল্লাহর) নবী তোমাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করেছেন? আমি (বিনীত কণ্ঠে) বললামঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর কসম বিষয়টি এমন নয়। প্রকৃত বিষয় হলো আমার ধারণা হলো আপনার মৃত্যু হয়ে গিয়েছে। কারণ আপনি সিজদা অনেক দীর্ঘায়িত করেছেন। তিনি বললেন, জান, এটি কোন রাত? আমি বললামঃ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সঃ) ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ এটি শাবানের পঞ্চদশ রজনী। আল্লাহ তাআলা এ রাতে স্বীয় বান্দাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান, ক্ষমা প্রার্থীদের ক্ষমা করেন, অনুগ্রহপ্রার্থীদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। আর হিংসুকদেরকে তাদের অবস্থার উপরই ছেড়ে দেন। তাদের বিষয়টি মূলতবী রাখেন।

( বায়হাকী শুআবুল ঈমানে এ হাদীছটি বর্ণনা করতঃ বলেছেন এটি মুরসাল ও জায়িদ খঃ ৩, পৃঃ ৩৮২ )

প্রায় একই রকমের হাদীছ বাইহাকী শরীফেই বর্ণিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রঃ) হতে বর্ণিত সে হাদীছে রসূল (সঃ) এ রজনীতে যে নামায পড়েছেন এবং দীর্ঘ সেজদায় পড়ে ছিলেন এবং সেজদা রত অবস্থায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ দোয়া করেছেন সেই কথাও উল্লেখ রয়েছে।

( দেখুনঃ শুআবুল ঈমানঃ খ-৩ , পৃ-৩৮৪ )

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় থেকে রসূলের কয়েকটি আমল প্রমাণিত হয়ঃ

- ১। এ রাতে রসূল (সঃ) বেশী বেশী নফল নামায আদায় করেছেন।
- ২। দীর্ঘ সেজদার মাধ্যমে স্বীয় প্রভুকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করেছেন।
- ৩। শবে বরাতে যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রদান করেছেন।
- ৪। আল্লাহর নিকট দয়া, দোআ-প্রার্থনা করেছেন।
- ৫। গুনাহগারদের ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং অনুগ্রহ প্রার্থনাকারীকে অনুগ্রহ ও দয়া প্রার্থনা করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

তাই এ রজনীতে প্রত্যেক রসূল প্রেমিকের জন্য উপরোক্ত কাজ ও আমলগুলো আঞ্জাম দেয়া সঙ্গত কর্তব্য।

**শবে বরাতে দু'আ ও তওবার মাধ্যমে গুনাহের মার্জনাঃ**

হযরত আয়েশা (রঃ) কর্তৃক রসূল (সঃ) এর শবে বরাতে কবরস্থান গমণ এবং সেখানে রাত্রি জাগরণ প্রসঙ্গে একটি লম্বা হাদীছের একাংশে বর্ণিত আছেঃ

" অতঃপর প্রিয় নবী (সঃ) বললেনঃ হে আয়েশা ! তুমি কি আমাকে আজকের রাতে নামাযে দণ্ডায়মান অবস্থায় অতিবাহিত করার অনুমতি দিবে? আমি (আয়েশা) বললামঃ নিশ্চয়ই; আপনার উপর আমার পিতা-মাতা কোরবান হউক। অতঃপর তিনি দীর্ঘ সময় (নামাযে) দণ্ডায়মান থাকার পর দীর্ঘ একটা সিজদা করলেন। এমনকি আমার ধারণা হলো, তিনি ওফাত পেয়ে গেছেন। আমি তাকে স্পর্শ করার ইচ্ছা করলাম এবং তার পায়ের তলায় হাত রাখলাম তখন সামান্য স্পন্দন অনুভব হল। আমি আনন্দিত হলাম আমি তাকে সেজদা অবস্থায় এই দোআ পড়তে শুনলাম।

اعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضائك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك لا أحصى ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك

'হে আল্লাহ ! তোমার ক্ষমার মাধ্যমে তোমার শাস্তি হতে আশ্রয় চাই। তোমার সন্তুষ্টির দ্বারা তোমার অসন্তুষ্টি হতে আশ্রয় চাই। তোমার করুণা দ্বারা আশ্রয় চাই তোমার ক্রোধ হতে। তোমার দিকেই খাবিত হই। তুমি এমন, যেমন তুমি তোমার প্রশংসা করেছ।'

সকালে (যখন) আমি তাঁর সাথে আলোচনা করলাম তখন তিনি বললেনঃ হে আয়েশা ! তুমি এই দোয়া মুখস্থ করবে? আমি বললামঃ অবশ্যই। তিনি বললেনঃ শিখে নাও। আমাকে এই কলিমাগুলো জিবরাইল (আঃ) শিখিয়েছেন এবং সেজদা অবস্থায় এটি বার বার পড়তে বলেছেন। "

( বাইহাকী শুআবুল ঈমানঃ ৩/৩৮৪, হাদীছটি দুর্বল তবে অন্যসূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত আছে। )

শবে বরাতে প্রভুর দরবারে দুআ ও প্রার্থনা করার ব্যাপারে আরো একটি হাদীছ উদ্ধৃত করা হলো।

হাদীছটি ইমাম বায়হাকী (রহঃ) শুআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণনা করেছেন যার আংশিক বর্ণনা এখানে তুলে ধরা হলোঃ

" এক রাতে রসূল (সঃ) নামায পড়তে দাঁড়ালেন, তিনি সেজদা এত দীর্ঘ করলেন যে, আমি ধারণা করলাম তিনি ইন্তেকাল করে গেছেন...অতপর আমি কান পেতে শুনতে পেলাম যে, তিনি সিজদারত অবস্থায় এই দুআ করছেন

اعوذ بعفوك من عقابك وبرضاك من سخطك اعوذ بك منك اليك لأحصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك

যখন তিনি সেজদা হতে মাথা উঠালেন এবং নামায হতে অবসর হলেন তখন তিনি বললেনঃ হে আয়েশা ! তুমি কি ধারণা করেছ যে, আল্লাহর রসূল (সঃ) তোমার অধিকার হরণ করেছেন? অতঃপর রসূল (সঃ) বললেন, হে আয়েশা ! তুমি কি জান এটা কোন রজনী? হযরত আয়েশা (রঃ) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ভাল জানেন। রসূল (সঃ) বললেনঃ এটি শাবানের ১৫ তারিখের রাত। এ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করা হয়। দয়া প্রার্থীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয়। তবে বিদেয পোষণকারীদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয়। "

( দেখুনঃ বায়হাকী শুআবুল ঈমানঃ খ-৩ , পৃ-৩৮৪ )

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রসূল (সঃ) শবে বরাতে দীর্ঘ সময় ধরে দুআ ও প্রার্থনারত থাকতেন। তাই রসূল প্রেমিকদের কর্তব্য এ পবিত্র রজনীতে দুআ ও প্রার্থনার মধ্যে আত্মনিয়োগ করা।

**শবে বরাতেও যাদের ক্ষমা করা হয় নাঃ**

সর্বস্তরের মুসলমান ও ঈমানদার ধনী-দরিদ্র , যুবক-বৃদ্ধ , নারী-পুরুষ , কৃষক-শ্রমিক , ছাত্র-শিক্ষক , রাজা-প্রজা, আলেম ও নন আলেম নির্বিশেষে সকল মুসলমানকেই আল্লাহ তাআলা শবে বরাতে ক্ষমা করে থাকেন। কিন্তু কতিপয় দুর্ভাগ্য, কপাল পোড়া, মারাত্মক অপরাধী এমনও আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা এ রজনীতে ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না তারা স্বীয় কৃতকর্ম থেকে খালেস নিয়তে তওবা করে অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে না আসবে। এদেরকে ক্ষমা না করার দু'টি কারণ হতে পারেঃ

১। তাদের ভাগ্য খারাপ হওয়ার কারণে

২। তাদের কৃতকর্মের ফলে আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণে

এমন লোকের তালিকা বিভিন্ন হাদীছের বর্ণনায় প্রায় ডজন খানিক পাওয়া যায়। নিম্নে হাদীছের আলোকে তাদের কিছু তালিকা উদ্ধৃত করা হলোঃ

হযরত আয়েশা (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত রসূল (সঃ) গোরস্থানে গমন করা প্রসঙ্গে একটি লম্বা হাদীছের আংশিক বিবরণ এরকমঃ

রসূল (সঃ) বললেনঃ হে আয়শা ! তোমার কি এই ধারণা ছিল যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমার অধিকার ক্ষুণ্ণ করবেন? আসল কথা হলো জিব্রাইল (আঃ) আমার নিকট শুভাগমন করতঃ বললেন এটি শাবানের পঞ্চদশ রজনী এবং আল্লাহ তাআলা এই রাতে অনেক লোককে (মুসলমান) জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণ দেন, যার সংখ্যা কালব গোত্রের বকরীসমূহের পশম অপেক্ষা অধিক হয়ে থাকে। কিন্তু এই রজনীতে আল্লাহ তাআলা (১) মুশরিক, (২) হিংসুক (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। (৪) টাখনুর নীচে পায়জামা বা লুঙ্গি পরিধানকারী। (৫) মাতা-পিতার অবাধ্য সন্তান-সন্ততি । (৬) মদ্যপ (শরাব পানকারী ব্যক্তিদের প্রতি) রহমতের দৃষ্টি দেননা (ক্ষমা করেন না)।

( দেখুনঃ বায়হাকীঃ খ-৩ , পৃ-৩৮৪ ; সনদটি দুর্বল তবে অন্য সূত্রেও হাদীছটি বর্ণিত আছে। )

উপরোক্ত হাদীছে ছয়টি সম্প্রদায়ের অপরাধ অমার্জনীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পেছনে আমাদের দশ নং হাদীছে আরো একটি সম্প্রদায়ের কথা তালিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। হাদীছটির বিবরণ এরকমঃ

উছমান ইবনু আবিল আছ (রঃ) নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ যখন শা' বান মাসের ১৫ তারিখ রাত আগমন করে তখন জনৈক আহবানকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে আহবান করতে থাকেন যে, আছ কি কোন ক্ষমার ভিখারী, তাকে আমি ক্ষমা করে দিবো। আছ কি কোন যাচনাকারী, তাকে আমি দান করব ? এরপর যে কেউ যা চায় আল্লাহ তাআলা তাকে তাই দান করেন কিন্তু ব্যাভিচারিনী এবং মুশরিক ছাড়া।

( দেখুনঃ বাইহাকী শুআবুল ঈমানঃ খ-৩ , পৃ-৩৮৩ )

এই হাদীছে উপরোক্ত তালিকার সাথে যেনাকারী ও যেনাকারিনীকে যুক্ত করা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বর্ণনা পিছনে আমরা ৩ নং হাদীছে উদ্ধৃত করেছি। যার বর্ণনা এরূপঃ

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) ইরশাদ করেন শাবানের পঞ্চদশ রজনীতে মহান আল্লাহ স্বীয় সৃষ্টিজীবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং নিজ বান্দাদিগকে ক্ষমা করে দেন, তবে দু' সম্প্রদায় ব্যতীত। ১. হিংসুক ২. অন্যায়ভাবে হত্যাকারী।

( দেখুনঃ আততারগীব ওয়াততারহীবঃ খ-৪ , পৃ-২৩৯ ; মুসনাদে আহমদঃ খ-৬ , পৃ-১৯৮ )

হাদীছটির সনদ সহীহ।

এই হাদীছ দ্বারা অমার্জনীয় সম্প্রদায়ের তালিকার সাথে অন্যায় ভাবে হত্যাকারীও যুক্ত হলো।

উপরোক্ত হাদীছসমূহের দ্বারা প্রতীয়মান হলো যে, নিম্নোক্ত অপরাধী সম্প্রদায়ের অপরাধ শবে বরাতের রাতে ক্ষমা করা হবে না।

(১) মুশরিক। (২) হিংসুক। (৩) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। (৪) টাখনুর নীচে পায়জামা-লুঙ্গি পরিধানকারী। (৫) মাতা-পিতার অবাধ্য । (৬) মদ্যপ। (৭) ব্যাভিচারী-ব্যাভিচারিনী । (৮) অন্যায়ভাবে হত্যাকারী।

কোন কোন হাদীছে এ তালিকার সাথে

(৯) অন্যায়ভাবে কর আদায়কারী (১০) যাদু-টোনার পেশা গ্রহণকারী (১১) গণক তথা গায়েবী খবর

বর্ণনাকারী (১২) এবং বাদ্য-বাজনায় অভ্যস্ত ব্যক্তিদেরকেও উপরোক্ত তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইমাম গজালীর مكاشفات القلوب কিতাবে উদ্ধৃত হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে উপরোক্ত তালিকার সাথে

(১৩) ফিতনাবাজ (১৪) ফটো অংকণকারী এবং (১৫) চুগলখোরকেও সংযোজন করা হয়েছে।

( দেখুনঃ মুকাশাফাতুর কুলুব, বাংলা অনুবাদ মুফতী উবায়দুল্লাহ )

অর্থাৎ শবেবরাতে সাধারণ ক্ষমার আওতা বহির্ভূত করা হয়েছে।

( দেখুন মাযাহেবে হকঃ পৃ-২০২ , খ-২ )

সুতরাং শবে বরাতে পূর্বেই সকল মুসলমান নবীপ্রেমিক ব্যক্তিদের জন্য অত্যাৱশ্যকীয় কাজ হবে উপরোক্ত অপরাধসমূহের সাথে কেউ জড়িত থাকলে খালেছ মনে একাগ্রতার সাথে আল্লাহর দরবারে তওবা করে অপরাধ ক্ষমা করানো, অন্যথায় পবিত্র শবে বরাতেও এসব সম্প্রদায়ের অপরাধ ক্ষমা করানোর কোন পথ উন্মুক্ত থাকবে না। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন, আমীন।

### শবে বরাতে নবীজীর (সঃ) কবরস্থান গমনঃ

শাবানের পঞ্চদশ রজনীতে রসূল (সঃ) জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে গমন করা এবং সেখানে সকল কবরবাসীর উদ্দেশ্যে দোয়া করার প্রমাণও হাদীছে পাওয়া যায় বিধায় এ আমলকে ফকীহগণ শর্ত সাপেক্ষে সুন্নাত বা মুস্তাহাব বলে সাব্যস্ত করেছেন।

এ মর্মে হযরত আয়েশা (রঃ) হতে একাধিক হাদীছ বর্ণিত আছে সূত্রের দিক দিয়ে হাদীছগুলো দুর্বল হলেও বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ায় তা কমপক্ষে ফজীলত অর্জনের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য।

নিম্নে একটি লম্বা হাদীছের আংশিক তুলে ধরা হলোঃ

হযরত আয়েশা (রঃ) বর্ণনা করেন রসূল (সঃ) আমার নিকট আগমন করলেন এবং স্বীয় (অতিরিক্ত) পোশাক খুলে ফেললেন। কিছু সময় অতিবাহিত হতে না হতেই পুনরায় তিনি পোশাকটি পরিধান করে নিলেন। আমার ধারণা হলো তিনি স্বীয় পূতপবিত্র পত্নীগণের মধ্য হতে অন্য কারো নিকট চলে যাচ্ছেন। এ কারণে আমার খুবই আত্মমর্যাদাবোধ হলো আমি তার পিছনে পিছনে চললাম। যেয়ে দেখি তিনি জান্নাতুল বাকীতে মুসলমান নরনারীদের জন্য দোয়া ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। আমি মনে মনে বললামঃ তাঁর উপর আমার মাতা পিতা উৎসর্গ হোন। তিনি আল্লাহ তাআলার কাজে লিপ্ত আর আমি (আয়েশা) পার্থিব কাজে মগ্ন। আমি সেখান হতে স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্তন করলাম, (এই আসা যাওয়ার মাধ্যমে) আমার শ্বাস স্ফীত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে নবী করীম (সঃ) (আমার কক্ষে) আগমন করলেন এবং (আমার) শ্বাস স্ফীত হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। আমি (বিনীত স্বরে) বললাম আমার মাতা পিতা আপনার উপর কোরবান হোন। আপনি আমার নিকট আগমন করলেন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই দ্বিতীয়বার পোশাক পরিধান করে নিলেন। আমার এই ধারণার ফলে কঠিন ঈর্ষা হলো যে, আপনি অন্য কোন পবিত্র পত্নীর নিকট চলে যাচ্ছেন কি না। ঘটনা এ পর্যায়ে পৌঁছল আমি নিজেই বাকীয়ে গরকদে গিয়ে যা দেখলাম আপনি কি করছেন। তিনি বললেনঃ হে আয়েশা তোমার কি এ ধারণা ছিল যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমার অধিকার ক্ষুণ্ণ করবেন ? আসল কথা হলো জিবরাইল (আঃ) আমার নিকট এসে বললেনঃ এটি শাবানের পঞ্চদশ রজনী এবং মহান প্রভু এই রাতে অনেক লোককে জাহান্নাম হতে পরিভ্রাণ দেন যার সংখ্যা কালব গোত্রের বকরীসমূহের পশম অপেক্ষা অধিক হয়ে থাকে। (অবশিষ্ট হাদীছ অনুবাদসহ পেছনে উল্লেখ করা হয়েছে)

( দেখুনঃ শুআবুল ঈমানঃ ৩/৩৮৪ )

এ ধরণের আরো কতক হাদীছ দ্বারা শবেবরাতে রসূল (সঃ) কবরস্থানে গমন ও সেখানে মৃতদের জন্য দোয়া করার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই রসূলপ্রেমিক ভাইদের জন্য শবে বরাতে কবর যিয়ারত করা এবং নিকটাত্তীয়দের জন্য বা যে কোন মুসলমানের জন্য কবরস্থানে গিয়ে সূরা ইখলাছ, তাকাছুর ইত্যাদি সূরা পড়ে কবরবাসীর মাগফেরাতের জন্য দোয়া করা অন্যান্য আমলসমূহের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম আমল।

### কবরস্থানে গমন প্রসঙ্গে আয়শা (রঃ) এর হাদীছের একটি ব্যাখ্যাঃ

হযরত শাইখুল হিন্দ আল্লামা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহঃ) কর্তৃক একটি অতি মূল্যবান ফিকহী উসূল বর্ণিত আছে যা নিম্নরূপঃ

" মূলকথা হলো রসূল (সঃ) এর কৃতকর্ম দুই ধরণের হয়ে থাকে

১। যা রসূল (সঃ) রীতিমত করতেন বা অধিকপরিমাণে করতেন অথবা তা পালনকরার নির্দেশ দিয়েছেন

২। কিছু কাজ আছে যা রসূল (সঃ) হঠাৎ কখনো কখনো করেছেন বলে প্রমাণিত, কিন্তু নিয়মিত বিরামহীন করেন নি বা অন্যদেরকে তা পালন করার প্রতি উৎসাহিত করার প্রমাণ নেই। কাজেই এ দুই প্রকারের প্রত্যেকটিকে তার যথাযথ স্থানেই রাখা বাঞ্ছনীয়।

প্রথম প্রকারের উপর গুরুত্ব সহকারে নিয়মিত পালন করা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের আমলকে যথাস্থানে রাখার উপায় হলো মাঝে-মধ্যে তা করে নেয়া যেমন রসূল (সঃ) করেছিলেন। এটাকে নিয়মিত রুটিন বানিয়ে নেয়া উচিত নয়। "

উক্ত নীতিমালার আলোকে হযরতুল আল্লামা মুফতী তাকী উছমানী (দাঃ বাঃ) বলেন যে,

শাইখুল হিন্দেব উপরোক্ত নীতিমালাকে আমার সম্মানিত পিতা হযরত মুফতী শফী (রহঃ) বহু মাসআলার মধ্যে বাস্তবায়ন করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, শবেবরাতে কবর যিয়ারত। এ প্রসঙ্গে হযরত আয়শা (রঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ রয়েছে যে, হুজুর (সঃ) বাকীতে গিয়ে মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়া করেছেন, তাই সাধারণতঃ ধারণা করা হয় প্রত্যেক শবে বরাতে কবরস্থান যিয়ারত সুন্নাত। কিন্তু আমার পিতার বক্তব্য ছিল যে, প্রতি শবে বরাতে নিয়মিত কবরস্থানে ছুটে যাওয়া সুন্নাত নয়। যদিও জায়েয। তবে মাঝে মধ্যে কোন কোন শবে বরাতে কবর যিয়ারতে চলে যাওয়া এটা সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত। কেননা রসূল (সঃ) তাঁর জীবনে একবারই কবর যিয়ারতে গিয়েছিলেন শবে বরাতে, (নিয়মিত) যাওয়া রসূল (সঃ) ও কোন সাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়। এটাই উল্লেখিত হাদীছে আয়শার সঠিক ব্যাখ্যা বলে মনে হয়।

.....  
পর্ব ২০

### ওলী-বুজুর্গদের দৃষ্টিতে শবেবরাত পালনঃ

পূর্বে উল্লেখিত দলীলসমূহের আলোকে অধিকাংশ সলফে সালেহীন তথা ওলী বুজুর্গানে দীন শবে বরাতের তাৎপর্য ও ফজীলতের পক্ষে ছিলেন। তাঁরা রাতটিকে খুবই সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ মনে করতেন। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন, যেন রাতটি ইবাদতে কাটে এবং তার মাহাত্ম্য ও ফজীলত অর্জন করা যায়। কিন্তু যেমনিভাবে সলফে সালেহীন তো এই রাতে জাগরণ থেকে ইবাদত করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন, তেমনিভাবে এ রাতকে কেন্দ্র করে সংঘটিত যাবতীয় কুসংস্কার ও বিদআত থেকে কঠোরভাবে নিষেধ



করেছেন। কেননা, আহলে-হক রসূল প্রেমিক সকল মুসলমানের ঈমানী কর্তব্য হলো, যে আমল শরীয়তে যতটুকু প্রমাণিত সেই আমলটিকে ঠিক ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ রাখা। এর মধ্যে অতিরঞ্জিত করা, নিজ খুশিমত কোন আমল সংযোজন করা পরিস্কার বিদআত বলে গণ্য-যা দ্বীনের জন্য বড় সর্বনাশ ও পথভ্রষ্টতার মূল কারণ।

যথাঃ

আল্লামা ইবনুল হাজ্ব মালিকী উক্ত রাত সম্পর্কে সলফে সালেহীনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং তাদের আমল উল্লেখ করতে গিয়ে বলেনঃ

" সন্দেহ নেই, রাতটি একটি মুবারক রাত। মহান আল্লাহর নিকট মর্যাদাসম্পন্ন। মোটকথা, রাতটি যদিও রুদরের রাত নয়, তবুও তার মহান ফজীলত, গুরুত্ব ও তাতে উম্মতের বিশাল কল্যাণ রয়েছে। সলফে-সালেহীন রাতটির যথেষ্ট মর্যাদা দিতেন এবং তার আগমনের পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন। রাতটির যখন আগমন ঘটতো তখন তারা তাকে বরণ করে নেয়ার জন্য এবং তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। এটাই এ রজনীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন। "

( দেখুন - আল মাদখালঃ খ-১ , পৃ-২৯৯ )

অপর দিকে উক্ত রাতকে কেন্দ্র করে সংঘটিত বৈচিত্র্যময় কুসংস্কার ও বিদআত প্রতিহত করার নিমিত্তে সলফে সালেহীনের নিম্নোক্ত বক্তব্যও প্রনিধানযোগ্য।

" ... তবে রাতটির ফজীলত অনেক। তার এই মহান ফজীলতের দাবী হচ্ছে, ইবাদত প্রভৃতির মাধ্যমে তার যথাযথ শোকর আদায় করা। অথচ কোন কোন লোক অধিক শোকরের স্থানে অধিক বিদআতকে গ্রহণ করে নিয়েছে।

লক্ষ্য করছো না তারা যে সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত আলোর মেলা বসায় ! এমনকি প্রতিটি জামে মসজিদকেও তারা নানা ধরনের আলোকসজ্জায় সজ্জিত করে তোলে। এমনকি তার খুটির মধ্যে বিশেষ কৌশলে দড়ি বেঁধে সেখানেও আলোকসজ্জা করে। আর সীমিতরিজ্ঞ বাতি জ্বালানো অগ্নিপূজকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যদিও এরা অগ্নিপূজায় বিশ্বাসী নয়। কারণ অগ্নিপূজকরাই এমনভাবে অগ্নিজ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করে। "

( আল মাদখাল, ইবনুল হাজ্ব )

সলফে ও ফুকাহায়েকেরামের শবে বরাত পালনঃ

বিভিন্ন মাযহাবের ফুকাহা এবং উলামাদের থেকে একথা সুপ্রমাণিত যে এ রাতে জাগরণ থেকে ইবাদতে লিপ্ত থাকা মুস্তাহাব। তাঁদের অভিমতও নিম্নে প্রদত্ত হলো।

১। হাম্বলী মাযহাবের সুপ্রসিদ্ধ ফকীহ আল্লামা শায়খ মানসূর ইবনু ইউনুস (রহঃ)লিখেনঃ

" হ্যাঁ, শাবানের পনের তারিখের রাত সম্বন্ধে ফজীলতের কথা বিদ্যমান। সলফে সালেহীন এই রাতে নামায পড়তেন। কিন্তু এ রাতে জাগরণের লক্ষ্যে মসজিদে জমায়েত হওয়া বিদআত। এ রাতে জাগরণ থেকে ইবাদত করার ফজীলত ঠিক দুই ঈদের রাতে জাগরণ থেকে ইবাদত করার ফজীলতের মতই। "

২। আল্লামা ইসহাক ইবনুল মুফলিহ (মৃঃ ৮৮৪ হিঃ) বলেনঃ

" হাদীছের কারণে মাগরিব এবং ইশার মাঝখানে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুস্তাহাব। অনেকেই বলেছেন,



আশুরার রাত, রজবের প্রথম তারিখ রাত এবং শাবানের পনের তারিখ রাতেও জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুস্তাহাব। "

৩। ফিকহে হানাফীর ইমাম মুহাম্মদ ইবনু আলী আল হাসফাকী (মৃঃ ১০৮৮ হিঃ) বলেনঃ

" সফরের পূর্বে দু'রাকআত, সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে দু'রাকআত, দুই ঈদের রাতে, শাবানের পনের তারিখে, রমজানের শেষ দশ রাতে এবং জিলহজ্জের প্রথম তারিখে জাগ্রত থেকে ইবাদত কতা মুসতাহাব। "

৪। আল্লামা ইবনু নুজাইম হানাফী (মৃঃ ৯৭০ হিঃ) বলেনঃ

" রমজানের শেষ দশ রাতে দুই ঈদের রাতে, পহেলা জিলহজ্জ রাতে, শাবানের পনের তারিখ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুসতাহাবের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি হাদীছসমূহে এসেছে। "

৫। আল্লামা হাসান ইবনু আম্মার ইবনু আলী আশ-শারাম্বলালী আল হানাফী (মৃঃ ১০৬৯ হিঃ) বলেনঃ

" শাবানের পনের তারিখ রাত জেগে ইবাদত করা মুস্তাহাব। "

৬। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী স্বীয় গ্রন্থ ( ماثبت بالسنة فى أيام السنة ٣٦٠ ) তে কিছু হাদীছ এবং তাবিঈদের কিছু বক্তব্য ও আমল নকল করার পর বলেনঃ

" ... সুতরাং উল্লেখিত হাদীছসমূহের ভিত্তিতে এই রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুস্তাহাব। ফাজাইলে আম্মালের ক্ষেত্রে এ ধরনের হাদীছের উপর আমল করা যায়। "

৭। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) এর শিষ্য ইবনে রজব হাম্বলী (রহঃ) লিখেনঃ

" শামের বিশিষ্ট তাবয়ী যেমন হযরত খালেদ ইবনে মাদান (রহঃ), ইমাম মাকহুল (রহঃ), লোকমান ইবনে আমের (রহঃ) প্রমুখ উচ্চমর্যাদাশীল তাবয়ীগণ শাবানের পনেরতম রজনীকে অত্যন্ত মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন এবং এতে খুব বেশী বেশী ইবাদত ও বান্দেগীতে মগ্ন থাকতেন। এসব বুজুর্গানেদীন হতে লোকেরা শবে বরাতের ফজীলত এবং মাহাত্য গ্রহণ করেছে। "

( দেখুন - লাইলাতুল মাআরিফ )

৮। হযরত আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী (রহঃ) লিখেনঃ

" শবে বরাতে জাগ্রত থেকে বিভিন্ন প্রকার নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকা যে মুস্তাহাব তাতে কোন মতভেদ নেই। কেননা এর প্রমাণ ইবনে মাজাহ এবং বাইহাকীর শুআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আলী (রঃ) হতে মারফু সূত্রে হাদীছ বর্ণিত রয়েছে এবং এই সংক্রান্ত অন্যান্য আর অনেক হাদীছ রয়েছে যা বাইহাকী সহ অনেকে বর্ণনা করেছেন। যেমনটি ইবনে হাজার মাক্কী (রহঃ) আল ঈযাহ ওয়াল বায়ান নামক গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। এসব হাদীছ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, নবী করীম (সঃ) এ রজনীতে অধিক পরিমাণে ইবাদত ও দুআ করতেন, নবীজী (সঃ) এ রাতে কবর যিয়ারতও করতেন এবং মৃত ব্যক্তিদের জন্য দোয়াও করতেন সুতরাং ( قولى فلى ) বাচনিক ও কর্মবাচক হাদীছ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে এ রজনীতে অধিক হতে অধিকতর ইবাদত করা মুস্তাহাব। প্রত্যেকের ইচ্ছা মারফিক (নফল ইবাদত করুক) চাই নামায পড়ুক অথবা অন্য কোন ইবাদত করুক। যদি কেউ নফল নামায পড়তে চায় তবে কত রাকাত ও কি পদ্ধতিতে পড়বে, কোন সময় পড়বে, সে ব্যাপারেও সে সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনক্রমেই এই রজনীতে কেউ এমন কাজ ও আমল করা বৈধ না যা হতে রসূল (সঃ) স্পষ্ট অথবা ইঙ্গিতে নিষেধ করেছেন। "

( দেখুন - নূরুল ঈজাহ মা শরহে হাশিয়াতি তাহতাতী )

৯। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) লিখেছেনঃ

" শবে বরাতের এতটুকু ভিত্তি আছে যে, এ মাসের পনের তারিখ দিবা-রাত্রি মহা সম্মানিত ও বরকতময়। আমাদের নবী করীম (সঃ) এই রাতে জেগে ইবাদত করার এবং দিনে রোযা রাখার প্রতি উৎসাহিত করেছেন আর এ রাতে তিনি মদীনার কবরস্থানে গিয়ে মানুষদের জন্যে মাগফিরাতের দুআ করেছেন। এছাড়া যতসব ধুমধাম মানুষ করছে, তার মধ্যে মিষ্টি বন্টন সংযুক্ত করে রেখেছে, তেমনিভাবে ফাতিহার প্রবর্তন করেছে এবং খুব গুরুত্বের সাথেই এসব কিছু করেছে এগুলো বাজে ও মনগড়া। "

১০। এ বিষয়ে হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহঃ) এর বক্তব্যও অভিনিবেশযোগ্য। তিনি বলেনঃ

" যেমনিভাবে এসকল হাদীছ থেকে এই পবিত্র রাতের অনেক মহান ফজীলত ও বরকত প্রতীয়মান হয় তেমনিভাবে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের জন্য এই রাতে নিম্নোক্ত আমলগুলো করা সুন্নাত

১। রাত জেগে নামায পড়া এবং যিকর ও তিলাওয়াতে মশগুল থাকা।

২। মহান আল্লাহর নিকট মাগফিরাত ও উত্তম প্রতিদান এবং উভয় জাহানের সফলতা কামনা করে প্রার্থনা করা। "

অতিরিক্তঃ

১। আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ

" এ রাতের ফজীলতে বেশ কিছু মারফু হাদীস এবং আছার বর্ণিত আছে যা প্রমাণ করে যে এ রাতটি ফযীলতপূর্ণ। পূর্ববর্তীদের কেউ কেউ এ রাতে বিশেষভাবে সালাত আদায় করতেন। ... ... যে মতের উপর আমাদের মাযহাবের বা অন্যান্য মাযহাবের বহু সংখ্যক বরং বেশিরভাগ আলেম রয়েছেন তা হলো এই রাতটি অন্যান্য রাতের উপর ফযীলত রাখে। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এর স্পষ্ট কথার মাধ্যমে এটি জানা যায়। আর যেহেতু এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং পূর্ববর্তীদের আমল সেসকল হাদীসকে সত্যায়ন করে, এই রাতের কিছু ফযীলত সুন্নান ও মুসনাদ গ্রন্থসমূহতে উল্লেখিত রয়েছে তবে এ রাত সম্পর্কে কিছু জাল হাদীসও রয়েছে। "

( ইক্তিদাউস-সিরাত আল মুস্তাকীম )

আল্লামা ইবনে তাইমিয়ার এ উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন সহ সলফে সালেহীনরা অনেকেই এ রাতকে ফজীলতপূর্ণ হিসেবে রায় দিয়েছেন এবং এ রাতে বেশি বেশি ইবাদত করেছেন।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া এ রাত সম্পর্কে আরও বলেনঃ

" অতএব যদি কোন ব্যক্তি একা একা সালাত আদায় করে তবে তার পক্ষে একদল সালাফকে পাওয়া যাবে এবং তার পক্ষে দলীলও রয়েছে। "

( মাজমুআয়ে ফাতওয়া )

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া তার ফাতওয়াতে লিখেনঃ

সাহাবারা, তাবঈনরা, সালাফরা এ রাত অনেক গুরুত্বের সাথে পালন করে এসেছেন।

( ২৩ খ, ১৩২ পৃ )

" পূর্ববর্তী যুগের অনেক উলামাই এ রাতের ফযীলতকে গ্রহণ করেছেন। যেসব বুজুর্গানে দ্বীনরা এই রাতের ফজীলত সম্পর্কে একমত হয়েছেন, তাদের মধ্যে উমর বিন আব্দুল আযীয, ইমাম আল শাফী, ইমাম আল আওয়যী, আতা ইবনে ইয়াসার, ইমাম আল মাজদ বিন তাইমিয়াহ, ইবনে রজব আল হাম্বলী এবং হাফিয যয়নুদ্দীন আল ইরাকী (রহঃ) অন্যতম। "

( লা তাইফুল মারিফ, হাফিজ ইবনে রজবঃ পৃ-২৬৩ , ২৬৪; ফাতহুল ক্বাদীরঃ খ-২ , পৃ-৩১৭ )

২। ইমাম আন নববী বলেনঃ

" ইমাম শাফেঈ তাঁর কিতাব 'আল-উম ' এ বলেন, আমি জানতে পেরেছি পাঁচটি রজনীতে দোয়া কবুল করা হয়, জুমআর রাত, ঈদুল আযহার রাত, ঈদুল ফিতরের রাত, রজব মাসের প্রথম রাত ও শাবান মাসের মাঝ রাত। "

এর পর তিনি উক্ত রাতসমূহতে পূর্ববর্তীদের কে কি আমল করতেন তা বর্ণনা করেন, পরে বলেনঃ

" ইমাম শাফেঈ বলেছেন, আমি এসব রাতে পূর্ববর্তীরা যা কিছু আমল করতো বলে বর্ণনা করেছি তা সবই মুস্তাহাব মনে করি, ফরজ নয়। "

( আল মাজমু )

৩। ইমাম সুয়ুতী (রহঃ) তাঁর 'হাকীকত আল সুন্নাহ ওয়াল বিদাহ' তে বলেনঃ

" শাবান মাসের মাঝ রাত সম্পর্কে, এর অনেক ফযীলত রয়েছে এবং এর কিছু অংশ অতিরিক্ত ইবাদতে কাটানো মুস্তাহাব। "

( হাকীকত আল সুন্নাহ ওয়াল বিদাহ আও আল আমর বি আল ইত্তিবা ওয়া আল নাহি আনাল ইবতিদা (১৪০৫/১৯৮৫ সংস্করণ), পৃ-৫৮ )

তিনি আরও লিখেনঃ

" এটি একাকী করতে হবে, জামাআতের সাথে নয়। "

৪। বাংলাদেশে কওমী আকীদার সবচাইতে বড় মাদ্রাসা হাটহাজারীর মুখপত্রের জুলাই/২০১১ এর ১৩-১৪ পৃষ্ঠায়, " ক্ষমা ও মার্জনায মহিমাম্বিত রাত শবে বরাত " শিরোনামে লিখা হয়েছেঃ

অসীম কল্যাণে ভরপুর এই শবে বরাত রজনী বান্দার জন্য মহান আল্লাহর বিশেষ এক নিয়ামত। কোন কোন মহল এ রাতের ফজীলতকে অস্বীকার করতে লাগলো। এসব লোক চরম ভুল ভ্রান্তির শিকার। হাদীস শাস্ত্র সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতাই সে ভুল ধারণার একমাত্র কারন। উপমহাদেশের বিখ্যাত হাদীস ব্যাখ্যাকার আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ) বলেন- এটা লাইলাতুল বরাত , এ রাতের ফজীলত

সম্পর্কীয় হাদীসগুলো সহীহ তথা নির্ভরযোগ্য।(আরফুশ শাযী শরহে তিরমিযী,পৃষ্ঠা-১৫৬)

৫। মাওলানা মাহিউদ্দীন খান তার মাসিক মদীনায় জুলাই/২০১১ এর ৪১ পৃষ্ঠায় “আল-কুরআনে শব-ই-বরাত: একটি বিশ্লেষণ” শিরোনামে লিখা হয়েছেঃ

সূরা দুখানের লাইলাতুম মুবারকা শব্দের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সূরা দুখান কুরআনের ১ম থেকে ৪৪নং সূরা। ৪৪ এর অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি  $8+8=৮$ ; ৮ দ্বারা বুঝায় ৮ম মাস অর্থাৎ শাবান মাসে লাইলাতুম মুবারকা অবস্থিত। আবার কুরআনের শেষ থেকেও সূরা দুখান ৭১ নং সূরা।  $৭+১=৮$ , পুনরায় ৮ম মাসের দিকেই ইঙ্গিত করে। আবার এ সূরার প্রথম থেকে ১৪টি হরফ শেষ করে ১৫তম হরফ থেকে লাইলাতুম মুবারকায় কুরআন নাযিল সংক্রান্ত আয়াত শুরু হয়েছে। এটা ইঙ্গিত করে যে, ঐ ৮ম মাসের ১৪ তারিখ শেষ হয়ে ১৫তারিখ রাতেই লাইলাতুম মুবারকা। এই সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ প্রমাণ করে, সূরা দুখানে বর্ণিত লাইলাতুম মুবারকা ১৪ই শাবান দিবাগত ১৫ই শাবানের রাত। অর্থাৎ লাইলাতুল বারাত বা শব-ই-বারাত। এছাড়া মুফাসিসরীনদের বিশাল এক জামাত দাবী করেছেন, সূরা দুখানে বর্ণিত যে রাতকে লাইলাতুম মুবারকা বলা হয়েছে তা অবশ্যই শব-ই-বরাত। (ইমাম কুরতবী, মোল্লা আলী কারী (রহ), বুখারী শরীফের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হাফিজুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) এবং হাম্বলী মাজহাবের অন্যতম ইমাম বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী রহমাতুল্লাহি সহ আরো অনেকে এ বিষয়ে একমত)

৬। মাসিক আল জামিয়া এর জুলাই/২০১১ সংখ্যায় “লাইলাতুল বারাত: করনীয়-বর্জনীয়” শিরোনামে প্রকাশিত আর্টিকলে লিখা হয়েছেঃ

শবে বরাতের ফজীলত হাদীস শরীফ দ্বারা ছাবেত তথা প্রমানিত নয়, এ কথা বলা সঠিক নয়, বরং বাস্তব কথা হলো দশ জন সাহাবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ রাতের ফজীলত সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায়। সঠিক কথা হলো, এ রাত হলো ফজীলতের রাত। এ রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা সওয়াব ও পূন্যের কাজ, যার অনেক গুরুত্ব কুরআন ও হাদীস পাকে রয়েছে। (বায়হাকী, মিশকাত ১ম খন্ড)

৭। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের প্রধান খলীফা মুজহিদে আযম মাওলানা সামসুল হক ফরীদপুরী সাহেব প্রতিষ্ঠিত মুখপত্র মাসিক আল আশরাফ এর জুলাই/২০১১ সংখ্যায় “শবে বরাত নিয়ে প্রান্তিকতা” শীর্ষক আর্টিকলে লিখা হয়েছেঃ

শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীস বেশ কয়েকজন সাহাবায়ে কিরাম থেকে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। এ জন্য এসব হাদীসকে দুর্বল অনির্ভরযোগ্য বলে অস্বীকার করার আদৌ কোন সুযোগ নেই। হাদীস দ্বারা শবে বরাত প্রমানিত এটা কিন্তু স্বীকার করতেই হবে। এক শ্রেণীর মুসলমান রয়েছেন যারা শবে বরাতের ফজীলত শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকারই করেন না। এটা মারাত্মক প্রান্তিকতা যা অতি জগন্য ব্যাপার।

৮। শায়খুল হাদীস মাওলানা আযীযুল হকের মুখপত্র মাসিক রাহমানী পয়গাম জুলাই/২০১১ সংখ্যায়, “শবে বরাত; জীবন বদলে যাক মুক্তির আনন্দে” শিরোনামের আর্টিকলে লিখা হয়েছেঃ

এক শ্রেণীর লোক মনে করে, শবে বরাতের কোন অস্তিত্বই নেই ইসলামে। ইসলামের সঠিক দৃষ্টিবঙ্গি কি তা আমাদের জানা দরকার। কুরআন হাদীসের বক্তব্য থেকে জানতে পারি, চৌদ্দই শাবান দিবাগত রাতটি অত্যন্ত বরকতময় মহিমাম্বিত এক রজনী। যাকে অবহিত করা হয় শবে বরাত নামে। শব্দটির অর্থ হচ্ছে মুক্তির রজনী। এ রাতে মহান রাক্বুল আলামীন রহমতের দৃষ্টি দেন, দয়ার সাগরে ডেউ উঠে, মাগফিরাতের দ্বার উন্মোচিত হয় পাপি-তাপি সকল বান্দার জন্য।

৯। মাসিক দাওয়াতুল হক জুলাই/২০১১ সংখ্যায় “শবে বারাত; কয়েকটি তাহকীকি মাসআলা” শিরোনামে লিখা হয়েছে-

সহীহ হাদীস থাকা অবস্থায় শবে বরাতের ফজীলত ও গুরুত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা এবং এ সংক্রান্ত সকল বর্ণনাকে মওজু বা জয়ীফ বলা কত যে বড় অন্যায়, তা তো বলাই বাহুল্য। শবে বরাতের গুরুত্ব ও ফজীলত প্রমানিত হওয়ার জন্য হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা বর্ণিত একটি হাদীস শরীফই যথেষ্ট। যদিও হাদীসের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে এ বিষয়ক আরো হাদীস উল্লেখ করা সম্ভব।

১০। মাসিকত আন নাবা এর জুলাই/২০১১ সংখ্যার ৭ পৃষ্ঠায় হাকিমুল উম্মাতে কওমীয়া মাওলানা আশরাফ আলী খানবী সাহেব কর্তৃক পবিত্র শবে বরাত এর হাদীস শরীফ নিয়ে সরাসরি সংগৃহীত একটি লিখা- “ক্ষমা ও বিপদমুক্তির রাত ১৫ শাবান” শিরোনামে পত্রস্থ হয়েছে।

## শেষ পর্ব

### উপসংহারঃ

শবে বরাতের আলোচনা কুরআন শরিফের সূরায় দুখানে لَيْلَةُ الْمَبَارَكَةِ দ্বারা করা হয়েছে। যা বাতিল বা ভুল বলা সঠিক নয়। তবে মুফাসসিরীনের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে এ তাফসীর অনগ্রাধিকার বলে সাব্যস্ত তাই শবে বরাতের প্রমাণ মূলত হাদীছভান্ডারেই বিদ্যমান।

সকল আহলে সুন্নাহ ওয়াল-জামাআতকে একথা দৃঢ়ভাবে বুঝে নিতে হবে যে , কুরআন বা সুন্নাহ দ্বারা যে বিষয়টি প্রমাণিত নয় এবং সাহাবায়ে কেরাম ও বুজুরগানে দ্বীনের আমল দ্বারাও প্রমাণিত নয়, সেটাকে দ্বীনের অংশ মনে করা বিদআত। বাস্তবে যদি শবেবরাতের ফজীলতের বিষয়টি উপরোক্ত নীতিমালার আওতায় পড়ে তাহলে নিঃসন্দেহে এই রাতটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়াও বিদআত হওয়ার কথা। কিন্তু বাস্তবতা এটা নয়। কেননা শবেবরাতের ফজীলত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় একথা বলার কোন সুযোগ নেই। বরং অন্তত দশজন সাহাবা (রঃ) শবেবরাত সম্পর্কে রসূল (সঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে থেকে দু'একটি হাদীছ সনদের বিবেচনায় দুর্বল হলেও অন্যান্য হাদীছগুলো সহীহ এবং আমলের মানদণ্ডে উপনীত হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ ইতিপূর্বে তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং শবেবরাতের সমর্থনে যখন দশজন সাহাবার ১২টির মত হাদীছ রয়েছে তাহলে এটাকে ভিত্তিহীন বলা রসূল (সঃ) - এর হাদীছ (সুন্নাহ) ও সকল সাহাবগণের প্রতি অনাস্তা প্রকাশ করার নামান্তর।

ইসলামের শ্রেষ্ঠ ও সোনালী যুগ তথা সাহাবায়েকেরাম তাবেঈন এবং তবে তাবেঈনের যুগেও শবেবরাতকে ফজীলতপূর্ণ রাত হিসেবে পালন করা ও বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হতো। সুতরাং এটাকে ভিত্তিহীন বা বিদআত আখ্যা দেয়ার কোন অবকাশ নেই। বরং এ রাতে ইবাদতের জন্য জাগ্রত থাকা অবশ্যই ছাওয়াবের কাজ এবং এ রাতের বিশেষ গুরুত্বও অনস্বীকার্য।

এ রাতে ইবাদতের বিশেষ কোন তরীকা নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত নেই। এটা বাস্তব সম্মত কথা। অনেকে মনে করেন এ রাতে বিশেষ পদ্ধতিতে এর রাকাআত নামায পড়তে হয়। প্রথম রাকাআতে অমুক সূরা এতবার, দ্বিতীয় রাকাআতে অমুক সূরা অতবার পড়তে হয়। না হলে শবেবরাতই পালিত হয় না। মূলতঃ এগুলোর কোনই প্রমাণ নেই। বরং এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও মনগড়া কথা। এ রাতে যত বেশি সম্ভব হয় নফল নামায পড়বে, কুরআন তিলাওয়াত করবে, বেশি-বেশি যিকির করবে, তাসবীহ পড়বে, অধিক দোয়া ও তাওবা-ইস্তিগফার করবে ইত্যাদি। সুতরাং এ জাতীয় সকল ইবাদত এ রাতে করা নিঃসন্দেহে ছাওয়াবের কাজ।

শবেবরাতে কবর যিয়ারত একটি প্রমাণিত আমলঃ



হাদীছ শরীফে এসেছে যে, রসূল (সঃ) এরাতেই কবরস্থানে গমন করেছেন। তাই মুসলমানগণও এরাতে কবরস্থানে গমন করে থাকেন। কিন্তু রসূল (সঃ) জীবনে এক শবেবরাতেই জান্নাতুল বাকীতে গমন করে ছিলেন। তাই যে কোন মুসলমানের জীবনে একবার যাওয়া অতি উত্তম। যদি প্রতি শবেবরাতে অতি গুরুত্ব ও দলবদ্ধতার সাথে, নারী-পুরুষ সমানভাবে কবরস্থানে গমন করে এবং এটাকে জরুরীও মনে করে তাহলে এটা হবে নিশ্চিত সীমালংঘন। তবে এসব রীতি-নীতি পরিহার করে প্রতি শবেবরাতে কবরস্থানে গমন করা শরীয়ত সম্মত।

### এ রাতে জামাআতের সাথে নফল নামাযঃ

অনেকে এরাতে জামাআতের সাথে নফল নামায পড়ে থাকেন। বিশেষ করে সালাতুততাসবীহ। জেনে রাখুন যে, ফরজ নামায এবং যেসব নামায রসূল (সঃ) জামাআতের সাথে আদায় করেছেনঃ যেমন তারাবীহ, বিতির এবং ইস্তিসকার ইত্যাদি নামায ছাড়া অবশিষ্ট সব ধরনের নামায একাকি পড়া উত্তম। এ কারণে হানাফী মাযহাব মতে নফল নামায জামাআতের সাথে পড়া মাকরুহে তাহরিমী, তথা নাজায়েয। সুতরাং শবে বরাতে ও শবে কদরে নফল নামায জামাআতের সাথে পড়লে ছাওয়াবতো দূরের কথা বরং গুনাহ হবে হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, " নফল ইবাদতের সঠিক মূল্য দাও, আর তা হলো তুমি থাকবে আর তোমার আল্লাহ থাকবে, তৃতীয় কেউ থাকবে না। "এটাই নফল ইবাদতের বিধান।

হাদীছে উল্লেখিত আল্লাহর আহবানের প্রতি লক্ষ করুন।

الاهل من مستغفر فاغفر له

অর্থাৎ আছো কি মাগফিরাতের কোন প্রত্যাশী যে, তাকে আমি মাফ করতে পারি।

দেখুন এখানে, **مستغفر** শব্দটি একবচন। অর্থাৎ একক ক্ষমাপ্রার্থী। এর অর্থ হলো আল্লাহ আমাকে নির্জনে ডাকছেন। তাহলে এসব পবিত্র রজনীতে জামাআতের সাথে আলোকসজ্জা করে সদলবলে ইবাদত করা কি সমীচীন হবে ? কখনো না। বরং এটা আল্লাহর পুরস্কারের কঠিন অবমূল্যায়ন বৈ কিছু নয়।

শবেবরাতে মত ফজীলতময় রাতটি শূরগুল করার জন্য নয়, কিংবা সিরনী-মিঠাই বিলি করার জন্য নয় , এমনকি সমোলন করার জন্যও নয়। বরং এ বরকতময় রাত আল্লাহর সঙ্গে একান্তে সম্পর্ক গড়ে তোলা ও গুনাহ মাফ করানোর রাত, জান্নাত কামাই করার রাত। এর মাঝে কোন অন্তরায় থাকা মোটেই সমীচীন নয়। উল্লেখ্যঃ অনেকেই অনুযোগের সুরে বলেন, একাকি ইবাদত করতে গেলে ঘুম ধরে। মসজিদ যেহেতু লোকজনে সরগরম থাকে, আলো-বাতি থাকে তাই সেখানে আর ঘুম কাবু করতে পারে না। এর জবাবে মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তক্বী ওছমানী (দাঃবাঃ) বলেন, বিশ্বাস কর নির্জনে ইবাদতে যে কয়েকটি মুহূর্ত কাটাতে, যে স্বল্পসময় আল্লাহর সাথে তোমার প্রেম বিনিময় হবে তা সারারাতের ইবাদতের চেয়ে অনেক উত্তম। কেননা এটা তখন সুন্নাহ মুতাবেক হবে, সেখানে ইখলাস বিদ্বমান থাকবে। ইখলাস বা সুন্নাহ মুতাবেক ইবাদত করলে অল্প আমলই ইনশাআল্লাহ নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে

### মহিলাদার জামাআতঃ

এ ব্যাপারে শরীয়তের মাসআলা হলো মহিলাদের জন্য ফরজ নামাযের জামাআতে অংশগ্রহণ মাকরুহ বা অপছন্দনীয়। সুতরাং তাদের জন্য যেখানে ফরজের জামাআতে অংশগ্রহণ অনুচিত, সেখানে সুন্নাহ বা নফল নামাযের জামাআত করার প্রশ্নই উঠে না। শুনে নিনঃ দ্বীনের মূল নীতি হলো শরীয়তের যথাযথ অনুসরণ ও অনুকরণ। তাই রসূল (সঃ) এর প্রেম ইশকের নামে শরীয়ত বিরোধী মনের যে কোন কামনা বাসনা অবশ্যই বর্জনীয়।



### শবেবরাতে হালোয়া-সিরনীতে ব্যস্ত রাখা শয়তানের চক্রান্তঃ

শবেবরাতে সুন্নাহ মূতাবেক ইখলাসের সাথে ইবাদত যতটুকু সম্ভব ততটুকু করা জরুরী। এ ছাড়া অবশিষ্ট অহেতুক কাজ যেমন হালোয়া-রুটি, সিরনী পাকানো ইত্যাদি অবশ্যই বর্জনীয়। এমনিতে যে কোন দিন হালোয়া রুটি পাকানো না জায়েয নয়। কিন্তু শবেবরাতে যে হালোয়া-সিরনী পাকানোর প্রথা চলে আসছে এবং জরুরী মনে করা হচ্ছে তা শয়তানেরই আবিষ্কার। দেখুন শবেবরাতে আল্লাহ তাআলা বনুকালাব গোত্রের বকরীর পশম পরিমাণ গোনাহ মাফ করার ঘোষণা দিয়েছেন। শয়তান তা কি করে সহ্য করতে পারে? সে কারণে সে নিজেই শবে বরাতে ভাগ বসাল তথা মানুষকে অহেতুক কাজে ব্যস্ত করে গোনাহ মার্জনা হতে বঞ্চিত রাখল। অতএব শয়তানের চক্রান্তে পড়া কোন নবী প্রেমিক উম্মতের জন্য সমীচীন হতে পারে না।

### শাবানের পনের তারিখ রোযা রাখাঃ

পূর্ব আলোচনা করা হয়েছে যে, শাবানের পনের তারিখে রোযার ব্যাপারে শুধু একটি হাদীছই পাওয়া যায়। তবে বর্ণনাসূত্রে তা দুর্বল। এ কারণে এ হাদীছের ভিত্তিতে পনের তারিখের রোযাকে সুন্নাহ ও মুস্তাহাব বলা অনেকের মতে অনুচিত। কিন্তু ২৯, ৩০ তারিখ ছাড়া পুরা শাবান মাসের রোযার ফজীলত বহু হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। উপরন্তু পনের তারিখ আইয়ামে বীজেরও অন্তর্ভুক্ত ( আরবী মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখকে আইয়ামে বীজ বলা হয়।) রসূল (সঃ) প্রায় মাসে আইয়ামে বীজের রোযা রাখতেন। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে শাবানের পনের তারিখের রোযা রাখে তাহলে অবশ্যই সে ছোয়াবের অধিকারী হবে।

মোট কথা, শবেবরাত নিয়ে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়ার কোন অবকাশ নেই। এ রাতের ফজীলতকে ভিত্তিহীন বলা চরম অজ্ঞতা। বরং রমজানের মাত্র দুসপ্তাহ পূর্বে এ বরকতপূর্ণ রাত আল্লাহ তাআলা প্রদান করে স্বীয় বান্দাদের জন্য রমজান মাসকে ইস্তিকবাল করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। রমজানের প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান করছেন। যাতে রমজান মাসের রহমত, বরকত ও মাগফিরাত পাওয়ার জন্য পূর্বেই গোনাহ হতে পরিত্রাণ অর্জন করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র শবেবরাতকে যথাযথা মূল্যায়ন করে ইবাদত করার আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন।

وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد واله وأصحابه أجمعین